এই প্রকাশনাটি ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশনাটির বিষয়বস্তুগত
সকল দায়ভার টেরে ডেস হোমস ইতালিয়ার, ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন/পররাষ্ট্র এবং
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহযোগিতা মন্ত্রণালয় এর কোন দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

Italian Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

ঢাকার পাঁচটি বস্তিতে জেন্ডার বিষয়ক গণগবেষণা







পাখির চোখে দেখা “করাইল বস্তি”, ঢাকা।

ঢাকার
পাঁচটি বস্তিতে
জেন্ডার বিষয়ক গণগবেষণা

সুরাইয়া বেগম
মোঃ ইফতেখার আলী

৫০ জন কিশোর-কিশোরী গণগবেষকদের পক্ষ থেকে

Italian Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

লেখক : **সুরাইয়া বেগম এবং মো: ইফতেখার আলী**
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ, এ্যাপার্টমেন্ট # ৩ এ, বাড়ি # ৫৪, রোড # ১, ব্লক এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

গণগবেষক : ঢাকার ৫ টি বস্তি এলাকায় (রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, আজিমপুর, পল্লবী এবং বাউনিয়া-বাঁধ) বসবাসরত ৫০ জন কিশোর-কিশোরী

সহযোগিতায় : অপরাজেয় বাংলাদেশ এবং এ্যাসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান

সম্পাদনায় : **টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া**
অনুবাদ : অদিতি কবির

আলোকচিত্র : **টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া**-র পক্ষে আবির আবদুল্লাহ (প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদের ভেতরের পাতা ও ভূমিকা) এবং
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (প্রতিবেদনে প্রকাশিত বাকী সব ছবি)

প্রচ্ছদ চিত্র : পল্লবী বস্তীর একজন কিশোরী

ডিজাইন ও প্রুফ রিডিং : বাঙলা কমিউনিকেশনস্ লি.

মুদ্রণ ও বাঁধাই : রুপা প্রিন্টিং প্রেস

প্রকাশনাকাল : মার্চ ২০১৭

এ্যাজেন্সিয়া ইতালিয়ানা কোঅপারেসসিওনে আল্লো ইস্ভিলুপ্পো এবং **টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া** এর সার্বিক অর্থায়নে পার্টিসিপেটরী এ্যাকশন রিসার্চ বা গণগবেষণাটি পরিচালিত এবং প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এ্যাজেন্সিয়া ইতালিয়ানা পার লা কোঅপারেসসিওনে আল্লো ইস্ভিলুপ্পো
রোড সালভাতোরে কনতারিনি, # ২৫,০০১৩৫, রোম, ইতালি।
রোড এ্যান্টোনিও কোচ্চি, # ৪, ৫০১৩১, ফ্লোরেন্স, ইতালি
aics.info@esteri.it | + 39 06 32492 303/305

http://www.agenziacooperazione.gov.it/

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agenziacooperazione.gov.it%2F%3Fpage_id%3D8550

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenziacoope azione.gov.it%2F%3Fpage_id%3D8550&text=contatti

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=contat-ti&url=http%3A%2F%2Fwww.agenziacooperazione.gov.it%2F%3Fpage_id%3D8550

https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenziacooperazione.gov.it%2F%3Fpage_id%3D8550

whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.agenziacooperazione.gov.it%2F%3Fpage_id%3D8550

টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
রোড এম. এম. বইয়ার্ডো, # ৬,২০১২৭, মিলান, ইতালি
info@tdhitaly.org | + 39 02 28970418

https://terredeshommes.it/

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fterrdeshomes.it%2Fcontattaci%2F&t=Contattaci

http://twitter.com/share?text=Contattaci&url=https%3A%2Fterdeshommes.it%2Fcontattaci%2F&via=tdhitaly

https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fterredeshommes.it%2Fcontattaci%2F&t=Contattaci

https://terredeshommes.it/contattaci/#

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ), ইতালিয়া-এর প্রতি, এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মটিতে আমাদের ওপর আস্থা রাখবার জন্য। বলা বাহুল্য, তাদের সম্পূর্ণ সহায়তা ছাড়া এত স্বল্প সময়ে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হতো না। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইয়োলে ভ্যালেন্তিনা লুক্কেজে, তোসিবা কাশেম এবং এজাজ নবীর প্রতি, এই গবেষণায় তাঁদের সামগ্রিক সহায়তার জন্য। আরবান এবং অপরাজেয় বাংলাদেশ (এবি)-এর বাউনিয়া বাঁধ, আজিমপুর, রায়ের বাজার, পল্লবী এবং মোহাম্মদপুরের কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের কাছে আমরা ঋণী গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদানের জন্য, যার ফলে আমরা নির্ভেজাল পরিবেশে দ্রুত এবং মানসম্মতভাবে কাজটি করতে পেরেছি। আশা করি সমন্বিত এবং পূর্ণ একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা তাঁদের ঋণ শোধ করেছি, যা তাঁদের ভবিষ্যৎ কাজে সহায়ক হবে।

বিভিন্ন দলীয় বৈঠকে আমাদের পরিচয় হয়েছে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে, যাঁদের বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রেক্ষিত এবং বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

৫০জন কিশোর-কিশোরী অ্যানিমেটর জেন্ডার বিষয়ের এই গণগবেষণায় অংশগ্রহণে আমাদেরকে সময় দিয়েছে। তাদের অবদান উল্লেখ না করা হলে এই কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা তাদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা আশা করবো এই কাজটির মাধ্যমে তাদের গল্পগুলো লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছুবে, যাতে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের পরিস্থিতি যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

সুরাইয়া বেগম
মো: ইফতেখার আলী
রিইব, ঢাকা

Italian Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Aparajeyo-Bangladesh
(Working with the disadvantaged Children)

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

সারসংক্ষেপ

১. ভূমিকা ৮
১.১ বাংলাদেশের বস্তিবাসী ৮
১.২ বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী ৯
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ১০
১.৪ কর্মপদ্ধতি: গণগবেষণা ১০
১.৫ প্রকল্প এলাকা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ ১১
১.৬ গবেষণা কাঠামো ১৩
২. গণগবেষণা আয়োজনে প্রাথমিক কার্যক্রম ১৩
২.১ প্রাথমিক ধারণাদান এবং গণগবেষণা কর্মশালা ১৩
২.২ স্থানীয় অ্যানিমেটর নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ ১৬
৩. গণগবেষণাদলের বৈঠক ১৭
৩.১ জেন্ডার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ ১৭
৩.১.১ বাল্যবিবাহ ১৮
৩.১.২ শিক্ষা ২২
৩.১.৩ ছেলে ও মেয়ের মধ্যকার বৈষম্য ২৫
৩.১.৪ পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ ২৬
৩.১.৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ২৬
৩.১.৬ জেন্ডার ও রীতি ২৭
৩.১.৭ নারীর প্রতি সহিংসতা ২৮
৩.১.৮ যৌন হয়রানি ৩০
৩.১.৯ বিনোদনের অভাব ৩১
৩.১.১০ গৃহকর্মে শ্রমবিভাজন ৩১
৪. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ৩২
৪.১ আলোচনার মূল বিষয়াবলী ৩২
৪.২ এফজিডি থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ৩৪
৫. বস্তি এলাকায় জেন্ডার বৈষম্য কমানোর মাধ্যম হিসেবে গণগবেষণা ৩৫
৬. উপসংহার এবং সুপারিশ ৩৬

তথ্য নির্দেশিকা ৩৮



চিত্র : বাউনিয়া বাঁধ বস্তি

ঢাকার পাঁচটি বস্তিতে জেন্ডার বিষয়ক গণগবেষণা

সারসংক্ষেপ

অপরিকল্পিত নগরায়নের সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বস্তিবাসীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। শহরে বসবাসকারীদের ৬০% বস্তিতে বসবাস করে এবং সেই সাথে এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক শহুরে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে (২১%)। এর ফলে সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মানে বেশ বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে বস্তিবাসীদের ওপর এ প্রভাব আরো গভীর। যেহেতু ভবিষ্যতেও নগরায়নের এই ধারা চলমান থাকবে, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত ও বাংলাদেশে কর্মরত একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ), ইতালিয়া '৫টি বস্তিতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য জীবনের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যের মোকাবিলা এবং সামাজিক উন্নয়ন' শীর্ষক অপরাজেয় বাংলাদেশ (এবি) এবং আরবান নামক দুটি স্থানীয় এনজিও-র মাধ্যমে তিন বছরের একটি প্রকল্প চালু করে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে সমানাধিকারমূলক জেন্ডার সম্পর্ক তৈরি করা, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা ও যে কোনো ধরনের অত্যাচার, হয়রানি ও সহিংসতার বিরোধিতার মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় গণগবেষণা বা পার্টিসিপেটরী অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা করেছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কিশোর-কিশোরী এবং এলাকাভিত্তিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গণগবেষণায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে জেন্ডার বিভাজন এবং রীতি কীভাবে শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহিংসতার ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী/শিশুদের দৈনিক জীবন যাপনকে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করা। পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক অনুশীলন, আচরণ এবং সহিংসতা হ্রাস করা।

এই গবেষণা কাজে পদ্ধতি হিসেবে গণগবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে। গণগবেষণা মানুষের সামষ্টিক আচারণকে নাড়া দিয়ে কাজ করে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের সৃজনশীলতাকে বের করে আনে। এই পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। দেশজ ও স্থানীয় জ্ঞান এবং নিজস্ব বিশ্লেষণকে ততটাই গুরুত্ব দেয়া হয়, যতটা দেয়া হয় বিশেষজ্ঞের অর্জিত জ্ঞানকে। প্রয়োজন হলে মানুষের কর্মকাণ্ডকে সহায়তার জন্য বিশেষ জ্ঞান, যেমন- জেন্ডার বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের সহায়তা নেওয়া হলেও তা কখনো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না। এর ফলে হয় আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়াও জনকেন্দ্রিক থাকে।

গবেষণা এলাকা ঢাকা শহরে অবস্থিত নির্দিষ্ট ৫টি বস্তি, যেখানে এবি ও আরবান- এই দুই সহযোগী সংস্থা তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই অঞ্চলগুলো হল: ১) পল্লবী, মিরপুর এলাকা; ২) লালবাগ, আজিমপুর এলাকা; ৩) জহুরীমহল্লা, মোহাম্মদপুর এলাকা; ৪) রায়েরবাজার বস্তি এলাকা এবং ৫) বাউনিয়া বাঁধ, মিরপুর এলাকা।

এবি ও আরবান এই গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য ৫০ জন কিশোর-কিশোরীকে নির্বাচন করেছিল। প্রতিটি বস্তি এলাকা থেকে ১০জন তিন দিনের জন্য গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার পরে দলটি নিয়মিতভাবে মিলিত হয় গণগবেষণা বৈঠকগুলোতে অংশ নেবার জন্য, প্রশিক্ষণে যেমনটি তারা শিখেছিল। এই পাঁচটি দল প্রত্যেকে ১২টি করে গ্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ

জড়িত করে। তারা সফলভাবে গণগবেষণা পদ্ধতিতে অ্যাকশনভিত্তিক কাজ সম্পাদন করে এবং খোলামেলাভাবে জেন্ডার বৈষম্য, উত্ত্যক্ত করণ (ইভ টিজিং), বাল্য বিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, গৃহস্থালীকাজে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন ইত্যাদিবিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর তাদের জীবনের নানা হৃদয়গ্রাহী কাহিনী সংগৃহীত হয় এবং এগুলোর পেছনের কারণ ও শক্তিগুলো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়।

এবি ও আরবান এই গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য ৫০ জন কিশোর-কিশোরীকে নির্বাচন করেছিল। প্রতিটি বস্তি এলাকা থেকে ১০জন তিন দিনের জন্য গণগবেষণাপ্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার পরে দলটি নিয়মিতভাবেমিলিত হয় গণগবেষণা বৈঠকগুলোতে অংশ নেবার জন্য, প্রশিক্ষণে যেমনটি তারা শিখেছিল। এই পাঁচটি দল প্রত্যেকে ১২টি করে গ্রুপ মিটিং -এ অংশগ্রহণ করেছে এবং সর্বমোট ৬০টি বৈঠক পরিচালিত হয়। তারা সুগভীর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত করে। তারা সফলভাবে গণগবেষণা পদ্ধতিতে একশন ভিত্তিক কাজ সম্পাদন করে এবং খোলামেলাভাবেজেন্ডার বৈষম্য, উত্ত্যক্ত করণ (ইভ টিজিং), বাল্য বিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, গৃহস্থালীকাজে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন ইত্যাদিবিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর তাদের জীবনের নানা হৃদয়গ্রাহী কাহিনী সংগৃহীত হয় এবং এগুলোর পেছনের কারণ ও শক্তিগুলো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়।

উত্ত্যক্তকরণ (যৌন হয়রানি) ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে নিম্নলিখিত কার্যক্রম নেয়া হয়-

১ উত্ত্যক্ত করা (ইভ টিজিং) নিয়ে একটি স্কুলে (গ্রিন লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

২ জেন্ডার বৈষম্যের বিপক্ষে ও সম-অধিকারের পক্ষে এলাকায় পোস্টার লাগান হয়।

৩ তারা সবাই মিলে দলের প্রত্যেক সদস্যের বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার মধ্যে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করে।

৪ তারা বস্তির মধ্যে উত্ত্যক্তকরণপ্রবণ এলাকার ম্যাপ তৈরি করে এবং এসব সমস্যা প্রবণ এলাকা সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

৫ তারা এলাকায় বাল্যবিবাহ, নারী শিক্ষা, উত্ত্যক্ত করা, মা-বাবার বিচ্ছেদ, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অভিভাবক এবং স্থানীয়দের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে ।

গণগবেষণা দলের সদস্যদেরকে সম-মনোভাবাপন্ন একটি সাধারণ মঞ্চে নিয়ে এসেছে। তারা এখন জেন্ডার বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক এবং কিশোরীদের নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক সংবেদনশীল।

গণগবেষণা প্রক্রিয়ার ফলে কিশোর-কিশোরীরা (দল সদস্য) নিজেদের পারিপার্শ্বিক, ঘরে ও বাইরে তাদের কাজ, তাদের প্রাপ্য সম্মান এবং সমাজে তাদের অবস্থান, তাদের স্বপ্ন ও আশা এবং সর্বোপরি, নিজেদের চিন্তাশক্তি সম্পর্কে এখন অনেক সচেতন। তাদের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এটি তাদের লেখালেখি, নৈপুণ্য, উচ্চারণ, বাগ্মীতা এবং বাচনভঙ্গীর সক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে এবং জেন্ডার সচেতনতার ক্ষেত্রে তাদের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। নিজের জীবনের সমস্যা, জেন্ডারের কারণে তারা যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে সেসব নিয়ে তারা এখন কার্যকরভাবে চিন্তা করতে পারে। এটি সম্ভব করেছে গণগবেষণা।

এসব তরুণ অ্যানিমেটর ও গবেষকরা শুধু যে সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে তা-ই নয়, এসব সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণও বের করতে চেষ্টা করেছে। তারা গণগবেষণা ব্যবহার করে সেটা থেকে শিখেছে কীভাবে পদ্ধতিগতভাবে একটি গবেষণা এগিয়ে নিতে হয়। সমষ্টিগত চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের প্রধান সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছে, অ্যাকশনে গিয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোপূর্বে তাদের ধারণাই ছিল না যে, নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের কিছু করার সক্ষমতা আছে। গণগবেষণা প্রক্রিয়া তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করেছে।



চিত্র : করাইল বস্তির মানুষের খাল পাড় হয়ে কাজে যাওয়া

কিশোর কিশোরীদের উন্নয়নে তারা নিম্নলিখিত সুপারিশ দিয়েছে :

১ বস্তিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের কারণে অন্য শ্রেণির মানুষের চাইতে বৈষম্যের শিকার হয় বেশি। সরকারি ও বেসরকারি নীতিতে এই বাস্তবতার প্রতিফলন থাকা উচিৎ।

২ বস্তিতে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা এই কিশোর-কিশোরীদের কোনো মানবাধিকার নেই। বিভিন্ন সংস্থার এই ইস্যুর ওপরে জোর দিতে হবে।

৩ কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের সচেতনতা প্রশিক্ষণ অত্যন্ত দরকার, যেন তাঁরা তাদের সন্তানদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন।

৪ জেন্ডার বৈষম্য, বাল্য বিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করার প্রধান ধাপ হলো উচ্চ শিক্ষা, জীবন দক্ষতার উন্নয়ন এবং কাজের সুযোগ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে নজর দিতে হবে।

৫ মা-বাবাদের সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্কুল। কিশোর-কিশোরীদের শুধু নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না, সম্মানও করতে হবে। তাদের জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

৬ কিশোর-কিশোরীরা অনেক সম্ভাবনাময়। যদি তাদের সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তারা জেন্ডার সমতা, জীবন দক্ষতার উন্নয়নে বিপ্লব ঘটাতে পারে। ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী জাতি গঠন করতে পারে। গণগবেষণা এই ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। তাই, গণগবেষণা পদ্ধতিটি সরকারি ও বেসরকারি দুই নীতি নির্ধারণেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭ নারী অধিকার স্থাপন করতে অংশগ্রহণমূলক জেন্ডার অডিট টুলস সকল সংস্থাকে ব্যবহার করতে হবে।

৮ নাগরিক অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হলে তথ্য অধিকার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করবে যে, কিশোর-কিশোরীদের যখনই কোনো তথ্য প্রয়োজন পড়বে তখন তারা সেটা নিশ্চিতভাবে পাবে। কারণ আমরা জানি যে তথ্যই শক্তি।

৯ শিক্ষা ও সামাজিক পরিসরে কিশোর-কিশোরীদের গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। তারা ভবিষ্যতের ভিত্তি তাই তাদের সমগ্র চিন্তাভাবনা সমাজে পরিবর্তন আনবে। এই পরিবর্তনগুলো হলো অর্থনৈতিক, মানসিক, সামাজিক এবং সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত।

১০ এই প্রক্রিয়া প্রকল্পে শুধু যে সফলভাবে কর্ম এলাকায় জেন্ডার বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং অন্যান্য সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে তা-ই নয়, এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যাবে সে সম্পর্কেও মতামত সংগ্রহ করেছে। টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ), ইতালিয়া এসব সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধানে তাদের গবেষণা এগিয়ে নিতে পারে।

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে নগরায়ন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে দ্রুত বাড়ছে বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা। বস্তি হলো নিম্নমানের গৃহায়ন ব্যবস্থা, অপ্রতুল কাঠামো, অনুপযুক্ত বসবাসের পরিবেশের বিস্তৃত এলাকা; এরই মাঝে বসবাসকারীদের কিছু অংশের মালিকানা, অথবা আইনানুগ আবাসী হিসেবে জমির দখলিস্বত্বের নিরাপত্তা থাকে। ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটলমেন্টস প্রোগাম (ইউএন- হ্যাবিটাট)-এ বস্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - বস্তি হচ্ছে শহরাঞ্চলে এমন বাসস্থান যেখানে একই ছাদের নীচে একদল মানুষ থাকে এবং যেখানে নিম্নলিখিত ৫টি অবস্থার এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে।

- বিপজ্জনক নয় এমন স্থানে স্থায়ী উপকরণ দিয়ে নির্মিত টেকসই বাড়ি
- বাসের জন্য যথেষ্ট জায়গা, যেন তিনজনের বেশি মানুষ একটি ঘরে না থাকে
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানির সুলভ সরবরাহ
- যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুবিধা
- আবাসস্থলের আইনানুগ মালিকানা বা দখল, যা জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে

টিডিএইচ ইতালিয়া, একটি আন্তর্জাতিক এনজিও, তিন বছর মেয়াদী 'ঢাকার ৫টি বস্তিতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য জীবনের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যের মোকাবিলা এবং সামাজিক উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প শুরু করে অপরাজেয় বাংলাদেশ (এবি) এবং আরবান নামক দু'টি স্থানীয় এনজিও-র মাধ্যমে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে সমানাধিকারমূলক জেন্ডার সম্পর্ক তৈরি এবং বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও যে কোনো ধরনের অত্যাচার, হয়রানি ও সহিংসতা বিরোধিতার মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের আওতায় রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) টিডিএইচ ইতালি-র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঢাকার ৫টি বস্তিতে গণগবেষণা পদ্ধতিতে একটি কাজ করেছে।

১.১ বাংলাদেশের বস্তিবাসী

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বস্তিবাসীদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি-শহরের অধিবাসীদের ৬০% বস্তিতে বসবাস করে এবং সেই সাথে এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক শহুরে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচেও বাস করে (২১%)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে বস্তিবাসীর সংখ্যা ভারতে ২৯%. পাকিস্তানে ৪৭% এবং নেপালে ৫৮% (মাহবুব উল হক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ২০১৪)। এই প্রতিবেদন মোতাবেক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, গত কয়েক দশকে দ্রুত নগরায়নের ফলে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষ অভিবাসন করায় শহরগুলোতে বিপুল সংখ্যক বস্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে গত তিন দশকে সর্বোচ্চ পরিমাণে নগরায়ন ঘটেছে, যা প্রায় ৪.১৯%। অপরিকল্পিত শহরায়নের ফলে শহরের জনগোষ্ঠির জন্য সুবিধাদি অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে কাঠামোগত অসুবিধা এবং সেবাদানের ঘাটতি, সেই সাথে যানবাহন, আবাসন, পানি ও স্যানিটেশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রাপ্তিতে অপ্রতুলতা। সংক্ষেপে বলতে গেলে বস্তিবাসীদের কোনো মৌলিক অধিকার নেই।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর বস্তিবাসী ও ভাসমান মানুষদের ওপর সর্বশেষ শুমারী অনুযায়ী ২০১৪ সালে সারাদেশে

২.২৩ মিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বসবাস করছিলো। এদের মধ্যে ১.১৪ মিলিয়ন পুরুষ, ১.০৯ মিলিয়ন নারী এবং ১,৮৫২ জন হিজড়া। শহর এলাকায় কোনোরকম পৌর সুবিধাহীন মানুষের সংখ্যা গত ১৭ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০.৪৩%। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা বিভাগের ১.০৬ মিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বাস করে, যেখানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা ৬৪৬,০৭৫ এবং লিঙ্গ অনুপাত হচ্ছে ১০৮.১৮। এদের মধ্যে ২১.২৯% কিশোর-কিশোরী (সংখ্যা ১৩৭,৫৭৯), বয়স ১০-১৯ বছরের (ইউএনডিইএসএ ২০১৬)। এদের লিঙ্গ অনুপাত ৯৮.৮২ (৬৭,৩৫৯ পুরুষ এবং ৭০,১২৭ নারী) [বিবিএস ২০১৫], যেখানে ৮২.৯৮ হচ্ছে তরুণ (বয়স ১৫- ২৪ বছর) [ইউএনডিইএসএ ২০১৬]।

শুমারীতে আরও জানা যায় যে, ২৭.২৫% বস্তিবাসীদের নিজস্ব বাড়ি আছে, অপরপক্ষে ৬৪.৮৭% বাস করেন ভাড়া বাড়িতে এবং ৬.৯৯% বিনা ভাড়ায় থাকেন। ৮৯.৬৫% ছাপড়া ঘরে বসবাসকারীরা বিদ্যুৎ সুবিধা পায়, ৯.৭% কেরোসিন কুপি ব্যবহার করে আর ০.৩৩% ব্যবহার করে সোলার শক্তি। রিপোর্টে নলকূপের পানি ব্যবহার করা ৫২.৪৮% নিশ্চিত করেছেন, ৪৫.২১% নির্ভর করেন কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত পাইপের পানির ওপর, ৪২.১৯% বলেছেন তারা অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহার করেন এবং ২৬.২৫% ব্যবহার করেন স্যানিটারি ল্যাট্রিন। প্রতিবেদন মোতাবেক ১৭.৮৮% হচ্ছে গৃহবধু, ১৩.৩৩% শিক্ষার্থী, ১৩.১৮% তৈরি পোষাক কারখানার কর্মী, ৭.৫৮% ব্যবসায়ী, ৬.৯২% রিকশা চালক, ৬.৭১% চাকুরিজীবী এবং ৬.৪১% গৃহকর্মী।

ঢাকার ১৫ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে বস্তিবাসী নারীরা অধিকতর পারিবারিক সহিংসতার ঝুঁকিতে আছেন দেশের অন্য অঞ্চলের নারীদের চাইতে। দুর্ভাগ্যবশত বস্তিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার ও সম্পদের ঘাটতি এবং উচ্চমাত্রার সহিংসতা দেখা যায়, সেই সাথে আছে জেন্ডার সম্পর্কে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী যা সহিংসতার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এই সহিংসতার সাথে যুক্ত আছে শিক্ষা, গৃহ সম্পত্তি, জেন্ডার সম্পর্কিত আচরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা।

১.২ বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী

২০১৬ সালের বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক রেখাচিত্র অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা ১৫৬,১৮৬,৮৮২ (জুলাই ২০১৬) [সিআইএ ২০১৬]। এর মধ্যে ২৮.২৭% ০-১৪ বছর বয়স্ক, ১৯.৫৩% হচ্ছে ১৫-২৪ বছর বয়স্ক, (পুরুষ ১৫,২৬১,৩৬৩ ও নারী ১৫,২৪৭,৬৩৫)। শহুরে জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৪.৩% (২০১৫)। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে জনতাত্ত্বিক রেখাচিত্রের ১৩%-এর বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের, যারা শিশুশ্রমে নিয়োজিত।

ইউনিসেফের মতে, বাংলাদেশের ২৭.৭ মিলিয়ন কিশোর-কিশোরী রয়েছে যাদের বয়স ১০-১৯ বছর, এদের ১৩.৭ মিলিয়ন মেয়ে এবং ১৪ মিলিয়ন ছেলে। এরা সমগ্র জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এবং এদের অধিকাংশের জন্য নিজেদের উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণের সুযোগ সীমিত। মাধ্যমিক স্তরে স্কুলে ভর্তি খুব কম, মাত্র ৭ মিলিয়ন (৩৮ শতাংশ) [ইউনিসেফ ২০১৬]। মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে পড়ার হার প্রাথমিক স্কুলের চাইতেও বেশি, মেয়েরা ৪৮% এবং ছেলেরা ৩৮%। আনুমানিক ৬.৯ মিলিয়ন শিশু, যাদের বয়সসীমা ৫-১৪ বছরের মধ্যে (সমগ্র শ্রম শক্তির ১২.৯%) এবং যারা বিশেষ করে মেট্রোপলিটন শহরে থাকে তারা কাজ করে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে। ৬৭%-এরও বেশি মেয়েরা বয়ঃসন্ধিতেই বিবাহিত হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫০% গর্ভধারণ ঘটে।

বন্ধুদের চাপে কিশোর ছেলেরা সংগঠিত অপরাধ ও সহিংসতা এবং বিপজ্জনক অভ্যাস যেমন- ধূমপান, মদ্যপান এবং নারকোটিকস জাতীয় দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের অধিকার ও চাহিদাগুলো অনেকটাই উপেক্ষিত থাকে, এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে খুব সাম্প্রতিক সময়ে। বিশেষ করে উপেক্ষিত থাকে কিশোরীরা, বেড়ে ওঠার সময়টাতেই হঠাৎ করে যারা শৈশব থেকে বৈবাহিক জীবনে পৌঁছে যায়। তারা নিজেদের অধিকার, স্বাস্থ্য ও জেন্ডার সমতার কথা জানে না এবং বন্ধুদের সাথে জ্ঞান এবং মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাদের চলাচল ও সুযোগ সীমিত।

এছাড়াও বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালীন সন্তান প্রসবের হার একটি উদ্বেগের বিষয়। প্রতি ১,০০০ নারীর মধ্যে ৮০.৬ জন শিশুর জন্ম দিচ্ছে ১৫ থেকে ১৯ বছরের নারীরা, যা সমগ্র এশিয়াতে গড়ে দ্বিগুণ (কর্তেজ ও সহযোগী ২০১৪)। কিশোরী মেয়েদের প্রতি যৌন হয়রানি

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ, যেখানে প্রতি ২ জন বিবাহিত কিশোরী মেয়ে (১৫-১৯ বছরের) স্বামী বা সঙ্গীর কাছ থেকে যৌন সহিংসতার শিকার হয় (ঢাকা ট্রিবিউন ২০১৪)।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

সমানাধিকারমূলক জেন্ডার সম্পর্ক তৈরি করা এবং বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে যে কোনো ধরনের অত্যাচার, হয়রানি ও সহিংসতার বিরোধিতার মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় একটি গণগবেষণা পরিচালনা করেছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কিশোর-কিশোরী এবং এলাকাভিত্তিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গণগবেষণায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে জেন্ডার বিভাজন এবং রীতি কীভাবে শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহিংসতার ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী/শিশুদের দৈনিক জীবন যাপনকে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক অনুশীলন, আচরণ এবং সহিংসতা হ্রাস করা ।

১.৪ কর্মপদ্ধতি : গণগবেষণা বা পার্টিসিপেটরী অ্যাকশন রিসার্চ

গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে গণগবেষণা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অরল্যান্ডো ফালস বোর্দা ১৯৭০-এর দশকে (২০০১) পার্টিসিপেটরী অ্যাকশন রিসার্চ বা গণগবেষণাকে উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা ও অনুশীলন করেছেন। গণগবেষণার মূল ধারণাটি হলো চিন্তা শক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোনো শ্রেনীই কোনো শ্রেনীর চাইতে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পণ করেন। এরকম সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেনীরা সাধারণ মানুষের চোখে 'বুদ্ধিবৃত্তিক' শ্রেনী বলে বিবেচিত হয়। ফলে, অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শিক্ষিতদের মতো চিন্তার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা শিক্ষিত শ্রেনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে, তার মানে এই নয় যে তাদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, বরং হয়তো সেটার ধার কমেছে মাত্র।

গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন। যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এককথায় শ্রমজীবীদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই এর মূল লক্ষ্য (ফ্রেইরে ১৯৭২)।

গণগবেষণা শব্দটির পেছনে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে, তিনি Paulo Freire (রহমান ১৯৯৪)। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে মানুষ সমাজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং সামষ্টিক নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং এ সময়ে তারা বুঝতে পারবে নিজেদের বাস্তবতায় তাদের নিজ উদ্যোগের দ্বারা তারা নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারবে। এটি তাদেরকে নতুনতর উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও পুণঃ বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ নিজস্ব প্রাক্সিসের (জ্ঞান-চিন্তা) সূচনা করবে। এর মাধ্যমে তাদের বাস্তবতা ও জ্ঞানের সচেতনতা বৃদ্ধি হবে এবং এর ফলে কোনো সম্ভাবনা একটি আত্ম-উন্নয়নমূলক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হবে।

গণগবেষণা কাজ করে গণআত্মউন্নয়ন চিন্তার প্রেক্ষিতে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের সৃজনশীলতাকে বের করে আনে। এই পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। দেশজ ও স্থানীয় জ্ঞান এবং নিজস্ব বিশ্লেষণকে ততটাই গুরুত্ব দেয়া হয়, যতটা দেয়া হয় বিশেষজ্ঞের অর্জিত জ্ঞানকে। প্রয়োজন হলে মানুষের কর্মকাণ্ডকে সহায়তার জন্য বিশেষ জ্ঞান, যেমন- জেন্ডার বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের সহায়তা নেওয়া হলেও তা কখনো জনমানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না। এর ফলে আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন ঘটে থাকে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াও জনকেন্দ্রিক হয়।

অ্যানিমেটররা গণগবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অ্যানিমেটররাই মানুষের সৃজনশীলতাকে নাড়া দেবার প্রধান বাহক। এই অ্যানিমেটররাই কঠিন সমস্যা মোকাবিলায় যৌথ প্রয়াসের সময় উদ্যোগী হয়ে সাংগঠনিক দক্ষতা দেখায় আর সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষের সহজাত ও সুপ্ত প্রতিভাকে বের করে আনে। অ্যানিমেটররা অনেক সময় সাধারণ মানুষ ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। একজন অ্যানিমেটর দল থেকেও আসতে পারে, আবার বাইরে থেকেও আসতে পারে। গণগবেষণা অনুধাবন করে কর্তৃত্ব-নির্ভরশীলতার সম্পর্কই ক্ষমতা, যেখানে জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ এবং এর উৎপাদনশীলতা বস্তুগত এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে গণগবেষণার ভূমিকা হচ্ছে প্রাক্সিস (কাজ-চিন্তা-কাজ) প্রক্রিয়ায় নিজস্ব জ্ঞান বা বিবেকনিষ্ঠতা ব্যবহার করে মানুষের ক্ষমতায়ন করা। এ ধরনের গবেষণায় প্রতিকূল সামাজিক অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ নিজের অর্ন্তদৃষ্টি এবং বিদ্যমান ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ এবং পদ্ধতিগতকরণের মাধ্যমে বাইরের কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়েই নিজেদের সমস্যার সৃজনশীল সমাধানের জন্য নতুন জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়।

১.৫ প্রকল্প এলাকা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ

গবেষণাটি ঢাকা শহরের পাঁচটি বস্তি এলাকাতে করা হয়েছে, যা অপরাজেয় বাংলাদেশ (এবি) ও আরবান নামক দু'টি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও-র প্রকল্প এলাকা।

এবি একটি বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের শহর এলাকায় সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সেবার জন্য স্থাপিত হয়েছে। এবি তাদের কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিশুদের অধিকারভিত্তিক নানান সেবা দেয়। এবি মনে করে যে শিশুরা নিজেদের অধিকারের মালিক এবং যেহেতু শিশুদের জন্যই অধিকারে বিনিয়োগ করা হয়, সেহেতু শিশু কোনো দানগ্রহীতা নয় বরং তার নিজের উন্নয়নের ক্ষমতায়নকৃত ব্যক্তি।

আরবান ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। আরবানের বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের সাথে এমনভাবে কাজ করা যেন তারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে। আরবান বিশ্বাস করে যে দেশে সম্পদ কম বলে নয় বরং সম্পদ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নেই বলেই বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন।

ওপরের দু'টি এনজিও ঢাকা শহরের পাঁচটি বস্তিতে অনেকদিন ধরে কাজ করছে, বিশেষ করে বস্তির কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে, যারা আগামী দিনে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম।

এবি কাজ করে পল্লবী (মিরপুর), লালবাগ (আজিমপুর), জহুরীমহল্লা (মোহাম্মদপুর) এবং রায়েরবাজার (হাজারিবাগ) এলাকায়। অন্যদিকে আরবান কাজ করে মিরপুরের বাউনিয়া-বাঁধ এলাকায়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত ঢাকার কেন্দ্রে অবস্থিত এই পাঁচটি বস্তি অনেক বড় এবং এখানে অনেক মানুষ বসবাস করে।

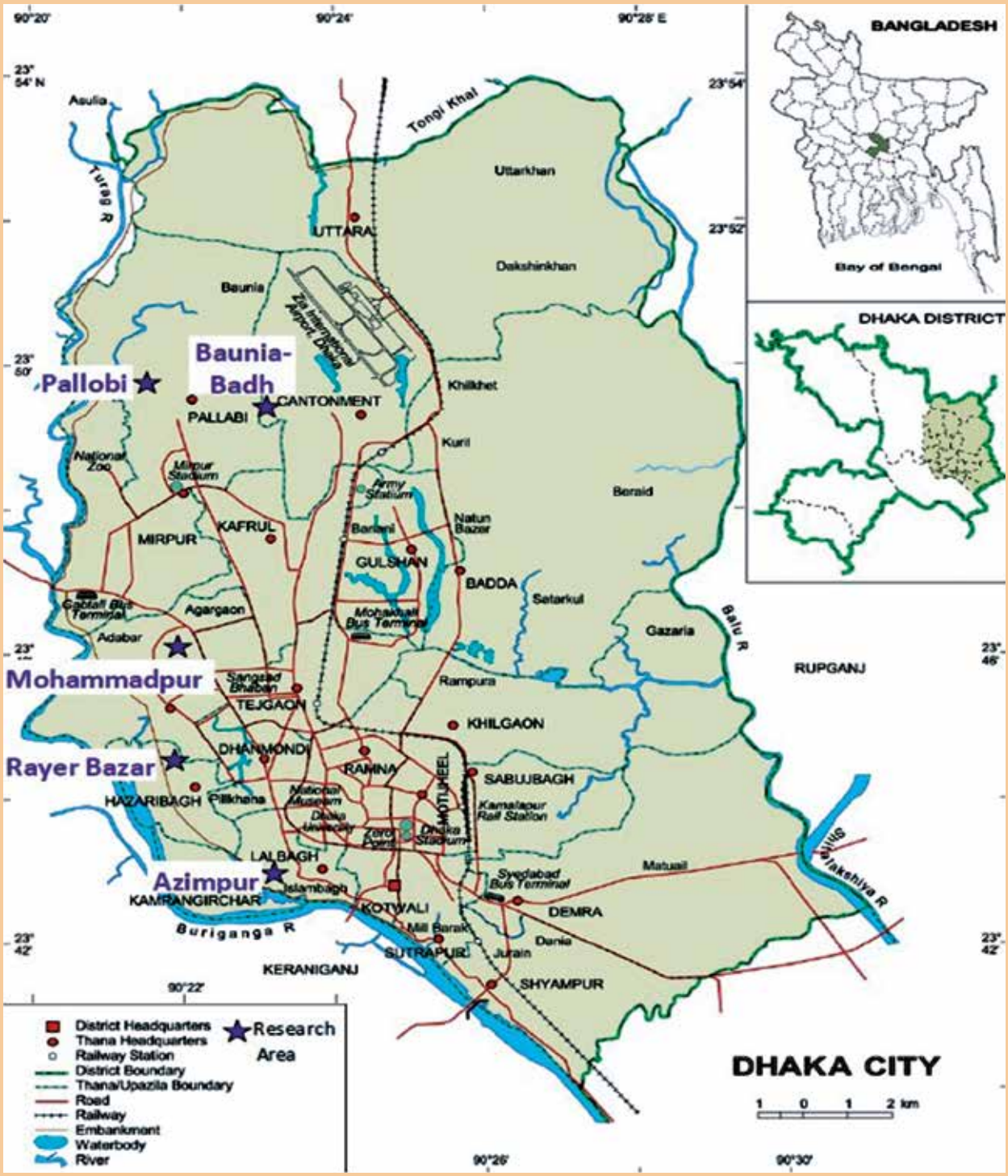

চিত্র : মানচিত্রে গবেষনা এলাকার অবস্থান

১.৬ গবেষণা কাঠামো

গবেষণা দল নির্বাচিত বস্তির কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে পাঁচটি গণগবেষণা দল সংগঠিত করেন (৮ জন কিশোরী এবং ২ জন কিশোর; প্রতি দলে মোট ১০ জন), ৫টি প্রাথমিক কাজ সম্পর্কিত পরিচিতি অনুষ্ঠান ও গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয় (প্রতিটি ৩ দিন করে)। গণগবেষণা প্রশিক্ষণকালে দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দল থেকে ২ জনকে অ্যানিমেটর হিসেবে নির্বাচিত করে দলের বাকী সদস্যরা, যারা পরবর্তীতে গণগবেষণা দলপরিচালনা করার জন্য মনোনীত হয়। প্রশিক্ষণের পর, প্রতিটি দল পরের ৩ মাসের মধ্যে কমপক্ষে ১২টি গণগবেষণা বৈঠক করে (প্রতি মাসে ৪টি করে বৈঠক)। প্রাক্সিস প্রক্রিয়ায়, নিয়মিত দলীয় বৈঠকে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা (নিজের এবং অপরের) সংগ্রহ করা হত চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য।

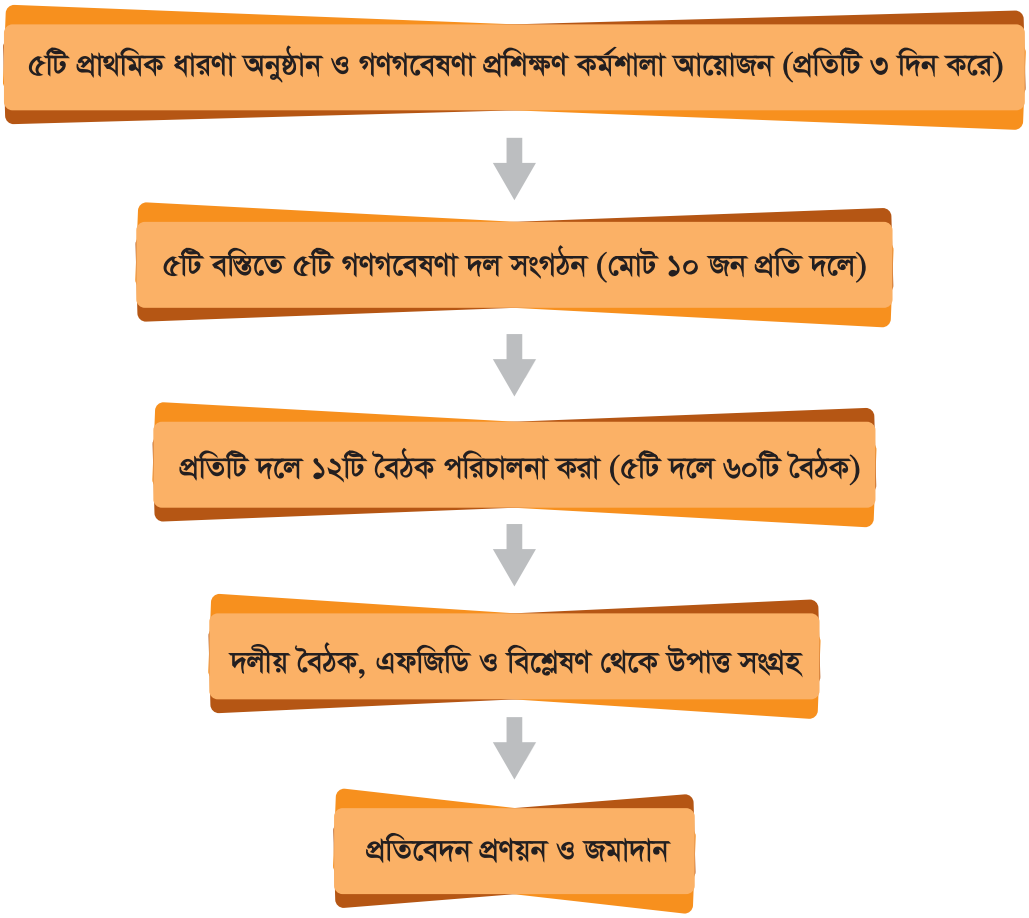

২. গণগবেষণা আয়োজনে প্রাথমিক কার্যক্রমসমূহ

২.১ কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাদান এবং গণগবেষণা কর্মশালা

এবি এবং আরবান নিজ নিজ কর্ম এলাকার ১০ জন কিশোর-কিশোরীকে নির্বাচন করে (৮ জন কিশোরী এবং ২ জন কিশোর), সব মিলিয়ে মোট ৫০ জনগবেষককে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিটি বস্তি এলাকার জন্য ১০ জন কিশোর-কিশোরীর একটি গবেষকদল সংগঠিত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার আগে রিইব গণগবেষণা কৌশল এবং পদ্ধতির ওপরে তিনটি প্রাথমিক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি ও কর্মশালা (৩ দিনব্যাপী) আয়োজন করে, গণগবেষণা দলের সভা পরিচালনার সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য। এই ৫০ জন কিশোর-কিশোরীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় (দু'টি দলে ২০ জন এবং একটিতে ১০ জন) এবং প্রতিটি ৩ দিন ব্যাপী সেশনের মাধ্যমে তাদের তিনটি ভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণগুলো রিইবের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্র : গণগবেষণা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় বাউনিয়া বাঁধ গণগবেষণা দল

এই ওরিয়েন্টেশন কর্মশালাসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. গণগবেষণা পদ্ধতির ওপর কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা;

২. কিশোর-কিশোরীরা যেসব জেন্ডার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার ওপর জোর দেয়া।

কর্মশালার সাতদিন আগে গণগবেষণা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবার জন্য অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত পাঠ উপকরণ (বাংলায়) দেয়া হয় :

ক. পর্টিসিপেটরী অ্যাকশন রিসার্চ : জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা, মো: আনিসুর রহমান

খ. শ্রীলঙ্কায় তৃণমূলে আত্ম-নির্ভরশীলতা : পান ও নারিকেলের দড়ি উৎপাদকদের সংগঠনের প্রেক্ষিতে- এস. তিলকারত্ন

গ. গণগবেষণা : অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে - সুরাইয়া বেগম

ঘ. গণ উদ্যোগ প্রণোদনা - মো: আনিসুর রহমান

এই কর্মশালায় প্রতিটি দল তাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করেছে, জেন্ডারের ওপর জোর ও অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল তাদের নিজেদের পরিস্থিতি বুঝবার অনুশীলন এবং তারা যেসব বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় সেগুলো যাচাই করার একটি প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে তারা সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

সেশনগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের গণগবেষণার বিভিন্ন বিষয় যেমন, সৃজনশীলতা, আত্মনির্ভরশীলতা, উন্নয়ন, সক্ষমতার উন্নয়ন, দারিদ্র্য, অ্যানিমেটরের ভূমিকা, প্রাক্সিস ইত্যাদির ধারণা সুদৃঢ় করার জন্য অংশগ্রহণমূলকভাবে আলোচিত হয়। প্রাক্সিস গণগবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কেননা এটি মানুষের সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করে, যেন তারা ইতিবাচকভাবে বিভিন্ন বিষয় সামাল দিতে পারে। তাছাড়া এটি মানুষের মধ্যে আলোচনা ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে গণগবেষণার আন্তঃপর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে।

এছাড়াও, অংশগ্রহণকারীরা একটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার পরে একটি গণগবেষণামূলক দলীয় মিটিং করে। পরিশেষে দলের প্রতিনিধি মিটিং-এর উঠে আসা বিষয়গুলো উপস্থাপন করে। অংশগ্রহণমূলকভাবে জেন্ডারের ধারণাটি সবিস্তারে আলোচিত হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলো হলো:

১. জেন্ডার কী?

২. জেন্ডার বৈষম্য

৩. জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন

৪. জেন্ডার বৈষম্য এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

৫. জেন্ডার ধারণাটি সামাজিকভাবে গঠিত এবং এটি নারী ও পুরুষের মধ্যকার মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়া

৬. নারীর অধস্তনতা

৭. নারীর উৎপাদনশীলতা এবং প্রজননশীলতাকে মূল্যায়ন না করা

অংশগ্রহণকারীরা জ্ঞান চর্চা (praxis) প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় এবং নিজেদের সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা এবং সক্রিয়ভাবে এই সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করা শেখে। এভাবেই তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। পরবর্তী ধাপ ছিল দলগতভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সবার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করা। তাদের সাথে আত্ম-নির্ভরশীলতার ধারণার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, যা তাদের আত্ম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মাঠ পর্যায়ের কাজে এই প্রশিক্ষণের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো, যেখানে তথ্য ও জেন্ডার বিষয়ক কেস স্টাডি সংগ্রহ করা হয়। সক্ষমতা উন্নয়নের এই অনুষ্ঠানে, এই ৫০ জন কিশোর-কিশোরী গণগবেষক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলো। তাদের মনে হয়েছে যে পরবর্তীতে দলের কাজের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণের প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে। একটার পর একটা সমস্যা সমাধানের অভ্যাসের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে তাদের জীবনে। যেহেতু তারা কাজের মাধ্যমে এটি শিখেছে তাই অংশগ্রহণমূলক কর্মের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে; এই ধরনের ফলপ্রসূ শিক্ষা যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অধিকার আদায় করতে পেরেছে তা ভোলা যায় না। তারা এখন জানে যে সমন্বিত প্রচেষ্টাই কোনো সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান নিয়ে আসে, চিন্তার প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে আর সৃজনশীলতাকে বের করে আনে। তারা জেনেছে যে কোনো সমস্যার মূলটি যদি বের করা যায়, তাহলেই সবচাইতে ভালো সমাধান হতে পারে। তারা মনে করে যে এই জ্ঞানটি জেন্ডার বৈষম্যের পেছনের মূল কারণটি চিহ্নিত করতে তাদের সাহায্য করবে, যা পরে তাদের দলীয় আলোচনাতেও দেখা যায়।

পল্লবী দলের সদস্য লাকি বলেন : "আমরা এসব সমস্যাগুলো নিয়ে এত গভীরভাবে আগে চিন্তা করিনি। এখন আমাদের সমস্যার পেছনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এটা আমাদের কাছে অনেকটা খেলার মতো।"

আদুরী বলেন : "আমি নিজেকে জানার এমন চেষ্টা আগে কখনো করিনি। আমি এখন নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি সচেতন।"

আজিমপুরের আলআমিন বলেন : "শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা কখনো ভাবিনি আমরা যা করছি তা আমাদের জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট কিনা।"



চিত্র : গণগবেষনা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় রায়ের বাজার ও আজিমপুর গণগবেষনা দল



চিত্র : গণগবেষণা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় মোহাম্মদপুর ও পল্লবী গণগবেষণা দল

২.২ স্থানীয় অ্যানিমেটরদের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ

৫০ জন কিশোর-কিশোরীকে সর্বমোট ৫টি দলে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়। গণগবেষণার প্রশিক্ষণকালে প্রতিটি দল থেকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় দুজন অ্যানিমেটর নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচনের ভিত্তি ছিল জ্ঞান, বাচনভঙ্গি, অপরকে বোঝা, ধৈর্য্য, বন্ধুভাবাপন্নতা, সৃজনশীলতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। ৫টি দল থেকে মোট ১০ জন অ্যানিমেটর নির্বাচিত হয়, তাদের ৮জন মেয়ে এবং ২জন ছেলে। এই ১০ তরুণ অ্যানিমেটর পরবর্তীতে নেতা হিসেবে নিজের দলকে দিক নির্দেশনা দেয়। ছেলেদের নির্বাচন করার সময় সমাজে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও সচেতনতা প্রয়োজন, এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছিল।

নির্বাচিত ১০ জন অ্যানিমেটর ১৯ অগাস্ট ২০১৬ রিইব সেমিনার কক্ষে অতিরিক্ত আরেকটি প্রশিক্ষণে অংশ নেয়, যেখানে অ্যানিমেটরের দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় অ্যানিমেটরের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়। তাদের মতানুসারে, অ্যানিমেটররা অপরকে উৎসাহিত করবে, বৈঠক ডাকবে এবং প্রতিবেদন তৈরি করবে, তাদের হতে হবে উন্নত বোধ বুদ্ধিসম্পন্ন, দলীয় কর্মের সময় তারা দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ছাড়াও তারা হবে উদ্যমী, বন্ধুভাবাপন্ন এবং ভালো বক্তা।

নির্বাচিত অ্যানিমেটররা উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারী নিশ্চিত হবার পর, প্রাথমিকভাবে গণগবেষণার প্রাথমিক কর্মশালায় জেন্ডার বিষয়ক পূর্বে চিহ্নিত অগ্রাধিকারমূলক তিনটি সমস্যা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। অ্যানিমেটরদের দায়িত্ব ছিলো গণগবেষণা মিটিং ডাকা, মিটিং-এর বিবরণী লেখা, দল সদস্যদের মাধ্যমে কর্ম পরিচালনা করা, কর্ম বিবরণী লেখা এবং তা রিইব-এর প্রতিনিধির কাছে দাখিল করা। কী প্রক্রিয়ায় এসব কাজ হবে তাও আলোচিত হয়।

৩. গণগবেষণা দলের বৈঠক

গণগবেষণা প্রশিক্ষণের পরে, দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের শিক্ষা অনুসারে গণগবেষণা দলের মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে জড়ো হয়। এই ৫টি দল ১২টি বৈঠকে অংশ নেয় এবং মোট ৬০টি বৈঠক পরিচালিত হয়। তারা গভীরভাবে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়। তারা সফলভাবে গণগবেষণা পদ্ধতি কাজে লাগায় এবং খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন বিষয়, যেমন- জেন্ডার বৈষম্য, উত্ত্যক্ত করা, বাল্যবিবাহ, সম্পর্ক, কাজের সুযোগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এই সক্রিয় কর্মভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষণ প্রক্রিয়া তাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করে। গণগবেষণা পদ্ধতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কেন্দ্র কখনোই কর্মদলের ওপরে চাপ প্রয়োগ করে না এবং এখানেও তা করা হয়নি। তবে কিছুটা পরোক্ষ নির্দেশনা ছিল যেন তারা কেন্দ্র বিন্দু থেকে না সরে যায়। গণগবেষণা দলের বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো।

৩.১ জেন্ডার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সমাজবিজ্ঞানে লিঙ্গ, জেন্ডার ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার বিশেষায়িত সংজ্ঞা রয়েছে। লিঙ্গ বলতে বোঝায় কোনো মানুষের জৈব এবং শারীরিক পরিচয়, যার মাধ্যমে সে শারীরিকভাবে পুরুষ অথবা নারী তা চিহ্নিত হয়। জেন্ডার বলতে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরুষের পরিচয় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক। জেন্ডার সামাজিক ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের আচরণ বা ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। তাই 'পুরুষ' ও 'নারী' হচ্ছে জৈবিক ব্যাপার, কিন্তু পুরুষত্ব বা নারীত্ব সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত পরিচয়। যদিও লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণাকে সহজেই মিলিয়ে ফেলা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সামাজিক, জৈবিক নয় (অ্যান্ডারসন ১৯৮৮)।



চিত্র : বাউনিয়া বাঁধ গণগবেষণা দলের বৈঠক

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা হলে, প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার সামাজিকভাবে গঠিত ধারণা, সহজাতভাবে নয়। জেন্ডার হচ্ছে অনেকগুলো সামাজিক প্রত্যাশা যা সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। আমরা যা শিখি তার সবই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপন্ন সামাজিক ধারণা (রেনজেত্তি ও ক্যুরেন ১৯৮৯)।

নারী ও জেন্ডারের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে বেশিরভাগ তাত্ত্বিকচর্চা অগ্রসর হয়েছে উন্নত বিশ্বে নারী বিষয়ক ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক চর্চার ভিত্তিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (বেনেরিয়া ও সেন ১৯৮১)। তাদের মতে নারীর অবদমন শুধু যে উৎপাদনশীলতায় নিহিত তা নয়, বরং পুনঃ উৎপাদনেও শিকড় রয়েছে। শুধু যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই বৈষম্য রয়েছে তাই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতেও তার স্বরূপ আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদার অবনমনকে দেখতে হবে 'শ্রেণীসম্পর্ক ও জেন্ডারসম্পর্ক'-এর পটভূমিতে (ব্রাইডন ও চ্যান্ট ১৯৮৯ : ৭-৮)।

এই অংশে পাঁচটি প্রকল্প এলাকায় ৫টি গণগবেষণাদল পরিচালিত বৈঠক নিয়ে আলোচনা করা হবে। এসব বৈঠকে আলোচিত বিষয়বস্তু এবং আলোচনার বিস্তার পর্যবেক্ষণ করা হবে, সেইসাথে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে এসব বৈঠকের বিষয়াবলীর মূল্যায়ন হবে ।

গণগবেষণা পদ্ধতিতে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করার জন্য, প্রতিটি সদস্যকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করতে হবে, পরিশেষে সমন্বিতভাবে সমাধান বের করতে হবে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতিটি দলকে কিশোর-কিশোরীদের প্রেক্ষিতে তিনটি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। প্রতিটি দলকে বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং তারা অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করে। জেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছিল এরকম :



চিত্র : গণগবেষকরা চিহ্নিত ইস্যুর উপর আলোচনারত

১	বস্তি এলাকায় বাল্যবিবাহ
২	উত্ত্যক্ত করা
৩	নারীর প্রতি সহিংসতা
৪	কিশোরীদের চলাচল ও বাক স্বাধীনতার অভাব
৫	নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য
৬	গৃহকর্মে অসম এবং জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন
৭	কিশোরী ও নারীদের বিনোদনের অভাব
৮	মতামত প্রকাশের প্রতিকূল পরিবেশ
৯	ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য
১০	পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
১১	যৌন আক্রমণ

৩.১.১ বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। আমাদের ধারণা ছিল বাল্যবিবাহ প্রধানত গ্রামীণ সমস্যা, কিন্তু সমস্যা প্রকট নগরজীবনেও, বিশেষ করে ঢাকার বস্তিবাসীদের জন্য । প্রায় সবগুলো দলই এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। বাল্য বিবাহের পেছনে তারা নিম্নলিখিত কারণ চিহ্নিত করেছে :

- অল্পবয়সে প্রেম ও দৈহিক সম্পর্ক। ঘনবসতির কারণে এবং গোপনীয়তার অভাবে বস্তিবাসী শিশুরা অতি অল্পবয়সে বড়দের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে যা তাদের শৈশবেই যৌনজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলে। এটি তাদের মধ্যে কৌতুহল জাগায় এবং যৌনাচারে আগ্রহ তৈরি করে। শিশুনির্যাতন ও যৌনসহিংসতার ঘটনাও এক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

- পরিবারের সদস্যদের সচেতনতার অভাব। শারীরিকভাবে কখন একটি মেয়ে বিয়ের জন্য তৈরি হয়ে থাকে তা তারা জানেননা, এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং দায়িত্ব নেবার জন্য একটি অল্পবয়সী মেয়ে মানসিকভাবে তৈরি কিনা সে বিষয়ের ওপর ও তারা গুরুত্ব দেননা।

- অর্থের অভাব। সমাজের সাধারণ ধারণা অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দিলে যৌতুক কম লাগে ও বিয়ের খরচ হ্রাস পায়। এই ভেবেই মা-বাবারা মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেন।

- স্থানীয় প্রভাবশালীদের কুদৃষ্টি থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। বস্তির ক্ষমতার কাঠামো ভিন্নতর। যারা স্থানীয় সালিশের ক্ষমতা রাখেন, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা অনেক সময় জোর করে বাল্যবিবাহ দিয়ে থাকেন।

- ছেলেদের ক্ষেত্রে অল্পবয়সে বিদেশ যাত্রা। বস্তির ছেলেরা কাজের সন্ধানে বিদেশ যায়। তবে যাবার আগে মা-বাবার কথায় বিয়ে করে যায়।

- বিয়ে নিবন্ধনকারী এবং তাদের দপ্তরের (কাজী অফিস) মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব। অংশগ্রহণকারীরা জানায় যে বিয়ে নিবন্ধন অফিস বয়স যাচাই করার ব্যাপারটি খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণ করে না। তাছাড়া মা-বাবারা জাল জন্মসনদ তৈরি করে এবং বিয়ের সময় তা সরবরাহ করে।

- চিরাচরিত মানসিকতায় বিয়েই হচ্ছে কোনো মেয়ের একমাত্র গন্তব্য। সমাজে এখনও এমন মানসিকতা বিদ্যমান আছে। শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধার অভাব যুগযুগ ধরে এমন মানসিকতা টিকিয়ে রেখেছে।

- বয়স হয়ে গেলে মেয়েরা আর ভালো পাত্র পাবেনা এমন বিশ্বাস করা। যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষ অল্পবয়স্কা নারীদের বিয়ে করতে চায়, যদি কোনো মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হবার জন্য অপেক্ষা করে তাহলে উপযুক্ত সকল পুরুষই ইতোমধ্যে বিয়ে করে ফেলবে এই ধারণা সমাজে প্রচলিত।

- আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের চাপ। সমাজ বাল্যবিবাহকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। অল্পবয়সী মেয়েদের মা-বাবাদেরকে সবাই জিজ্ঞেস করতে থাকে কখন তারা মেয়ের বিয়ে দেবেন। ফলে মা-বাবার ভেতর অস্থিরতা ও মানসিক চাপ তৈরি হয়। তাই ভুল করে হলেও তারা ভাবেন যে মেয়ের বিয়েতে দেরী করে তারা ভালো মা-বাবা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন না।

বাল্যবিবাহের পেছনে এই সব কারণগুলো চিহ্নিত করে তারা বাস্তবে এর প্রতিরোধে কাজও করে। বাউনিয়া-বাঁধ গণগবেষণা দল নিজ উদ্যোগে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে বাল্যবিবাহ এবং এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করতে তাদের এলাকার মা-বাবা ও কিশোর-কিশোরীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই আলোচনার মাধ্যমে দলের সদস্যরা নিজেদের এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা নেয়।

মা-বাবাদের সাথে আলোচনাকালে তারা সরাসরি বলে যে, বর্তমানে বিশেষ করে ১২-১৬ বছর বয়সের ছেলে- মেয়ের মধ্যে প্রেম একটি সাধারণ ব্যাপার। মা-বাবারা সরাসরি নিজেদের সন্তানসম ছেলে-মেয়েদের সাথে বাল্যবিবাহ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। মা-বাবারা বলেন যে তাদের সময়ে তারা প্রেম করতে ভয় পেতেন, কেননা গুরুজনরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করত। মেয়েরা মা-বাবাদের নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে বাধ্য হতো। সন্তানদের সাথে কৈশোরে যৌনতা ও প্রেম সম্পর্কে মায়েদের আলোচনা করা দরকার ছিল। এসব বিষয়ে তাদের অনেক কৌতুহল ছিল, কিন্তু আলোচনার কোনো উপায় ছিল না। এখন যেখানে থাকেন সেই বস্তি এলাকায়ও সন্তানদের সাথে প্রেম, যৌনতা এবং বিয়ে নিয়ে অভিভাবকদের খোলামেলা আলোচনা হয় এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

তাই এইসব বিষয়গুলো যদিও তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে ভাবায়, কিন্তু জনসমক্ষে এ নিয়ে আলোচনায় তারা খুবই বিব্রত বোধ করেন। তারপরও, এই মিটিং-এর আলোচনায় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় তারা কিছুটা সহজ হয়েছেন এবং জড়তা কেটেছে।

তবে বস্তি এলাকার জীবনযাত্রা অন্যরকম, এখানে গোপনীয়তা কম এবং শিশুরা বড়দের আচার-আচরণ অনেক অল্প বয়সেই শেখে। তাই শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন অনুভূতি আগেই জেগে ওঠে। এটি তাদের মা-বাবাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাছাড়া, মা-বাবারা স্বীকার করেছেন যে প্রেম, বিয়ে এবং দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা তাদের জন্য খুবই বিব্রতকর। যে সমাজে তারা বেড়ে উঠেছেন সেখানে বিদ্যমান সাধারণ সামাজিক রীতি অনুযায়ী এ রকম চিন্তাভাবনা করা বড় ধরনের পরিবর্তন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে নিজেদের মধ্যে আরও ভালো যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মা-বাবা ও সন্তানদের আরও খোলামেলা সম্পর্ক থাকতে হবে। মা-বাবার উচিত প্রেম বিষয়টি নিয়ে সন্তানদের সাথে কথা বলা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলা। আলোচনার সময় কিশোর-কিশোরীরা আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গণগবেষণা দলের সদস্যদের মতে মা-বাবারা তাদের কথা শুনতে চায় না না বা বলতেও দেয় না। বিশেষ করে যখন তারা নিজেদের কাজের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে চায় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায়। কিন্তু অভিভাবকরা অনেক সময় তাদের কোনো কথা শুনতে চায় না। বন্ধুর বাড়িতে যেতে চাইলে, এলাকার ভেতরে ঘোরাঘুরি করতে চাইলো, সরাসরি না করে দেয়। কিশোর-কিশোরীদের মতে তাদের কিছুটা হলেও বাক স্বাধীনতা এবং চলাফেরার অধিকার থাকা উচিত যা তাদেরকে মা-বাবা ও বন্ধুদের সাথে আরও ভালো সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করবে। মায়েরা এটিতে পুরোপুরি সায় না দিয়ে বলেন যে, ছেলেদের কিছুটা স্বাধীনতা দিলেও একইভাবে মেয়েদের দেয়া যাবে না। তবে যারা কঠোরভাবে এর পুরোপুরি বিরুদ্ধে ছিলেন না, তাদের অভিব্যক্তি কিছুটা নরম ছিলো।

গণগবেষণা কিশোর-কিশোরীদের মনের ওপর বেশ ভালো প্রভাব ফেলেছে বলা যায়। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তারা বাউনিয়া-বাঁধসংলগ্ন আদর্শনগর এলাকায় একটি বাল্যবিবাহ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণগবেষণা দলের সদস্য খাদিজার ভাষ্যমতে ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ।

কেস : 'একটি বাল্যবিবাহ স্থগিতকরণ'

স্বপ্না অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তার মা ও ভাই জোরপূর্বক তাকে বাল্যবিবাহে বাধ্য করছিলো। স্বপ্না বিয়ে না করতে বদ্ধপরিকর ছিলো, তাই সে তার বন্ধুদের খবর দেয়। স্বপ্নার ভাষ্যমতে, তার হবু স্বামীর ছয় সদস্যের পরিবারের দায়িত্ব নেবার পক্ষে সে তখন অনেক ছোট। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সে আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছিলো। তখন বাবা বেকার ছিলেন, পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিলো না। তবুও স্বপ্না তার মা ও ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে নিজের ইচ্ছার ব্যাপারে। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। স্বপ্না আত্মহত্যার কথাও ভাবে। আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়। সে বাথরুমে দরজা আটকিয়ে গলায় ফাঁসি দেবার কথা ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ পরেও বের না হওয়াতে তার পরিবার বিষয়টি আন্দাজ করতে পারে এবং তাকে বের হয়ে আসার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। তার প্রতিবেশিরাও একসাথে মিলে অনুনয় করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর সে জীবনকে আরেকটি সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয় ও বের হয়ে আসে। ইতোমধ্যে তার বন্ধুরা আরবান-এর একজন কর্মীকে খবর দেয় এই ব্যাপারে। এদিকে স্বপ্নার পরিবার বিয়ের আয়োজন করতে থাকে। পরিশেষে অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায়, আরবান কাউন্সেলর, স্থানীয় শিশু একাডেমির (শিশুদের জন্য একটি একাডেমি) কর্মী এবং তাদের কয়েকজন বন্ধু মিলে স্বপ্নার বাড়িতে যান; যেখানে পাত্র, পাত্রের আত্মীয় এবং বিবাহ নিবন্ধনকারী আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। এঁরা গিয়েই পাত্র ও তার আত্মীয়, স্বপ্নার মা, ভাই এবং বিয়ে নিবন্ধনকারীর সাথে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে যুক্তি তুলে ধরেন, তর্ক করেন এবং অনেক কষ্ট করে বিয়েটি বন্ধ করেন। শিশু একাডেমি মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পড়াশোনার ভার নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বপ্নার মা একটি মুচলেকায় সই করেন এই মর্মে যে তিনি স্বপ্নাকে ১৮ বছর বয়সের আগে অথবা তার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না। উল্লেখ্য যে অনেক অপ্রীতিকর বাগবিতণ্ডা সত্ত্বেও অবশেষে আরবান কাউন্সেলর এই বিয়ে সম্পাদিত না করতে পাত্র ও তার আত্মীয়দের বোঝাতে সক্ষম হন।

এই কেস স্টাডি থেকে দলের সদস্যরা একটি মূল্যবান শিক্ষা পায়। তারা অনুধাবন করে যে, এলাকায় এরকম বাল্য বিবাহের ঘটনা জানতে পারলে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা শিশু অধিকারভিত্তিক কোনো এনজিও থেকে সাহায্য নিতে পারে। তারা পাত্র এবং তার আত্মীয়দেরকে নিরুৎসাহিত করতে পারে, বিয়ে বন্ধ করতে পারে এবং তারা আইনি সাহায্যও নিতে পারে।

তাছাড়াও, বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে দলীয় আলোচনার সময় একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে কিশোরী মেয়েদের এই বিষয়ে জানা জরুরি কিনা। একজন সদস্য জাহানারা (ছদ্মনাম) বলে যে, সে সহ তাদের দলের অনেকেই সামাজিক ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়। আমরা তাকে বিস্তারিত বলার জন্য অনুরোধ করলে সে প্রথমে বলতে চাইছিল না। অনেকক্ষণ চুপ করে করে থাকার পর দেখা গেল তার চোখে পানি। শেষে তার জীবনের একটি কালো অধ্যায় সে আমাদেরকে জানায়। পরে সে জীবন কাহিনীটি লিখে দেয়। সে যা লিখেছিল তা এমন :

কেস : 'স্বপ্ন, ইচ্ছা এবং কর্তৃত্ব'

"প্রাইমারি স্কুলের পড়াশুনা শেষে আমি হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। আমার অভিশপ্ত জীবনের সেই শুরু। আমি তখন ভালোবাসা কী জানতাম না। আমি ভাবতাম দুইজন মানুষ যদি বাইরে ঘোরে বা অনেকক্ষণ কথা বলে তাহলে সেটাই প্রেম। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই এক ছেলের সাথে পরিচয় হয়। আমরা কথা বলতাম। আমার মা-বাবা তা জানতে পেরে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ষষ্ঠ শ্রেণির পর আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অনেক অনুরোধের পর আমি পরের বছর আরেকটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমি সপ্তম শ্রেণি শেষ করি এবং অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই। আমার বান্ধবী একটা ছেলেকে পছন্দ করত, আমরা সবাই বন্ধুর মতই কথা বলতাম, হাসাহাসি আর মজা করতাম। একদিন ছেলেটা হঠাৎ আমাকে বলে- আমি তোমাকে ভালোবাসি।। আমিও তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা রোজ কথা বলতাম। আমরা একজন আরেকজনকে চিঠি লিখতাম, যা এখন আর কেউ লেখে না। আমি যখনকার কথা বলছি সেটা ছিল ২০১১ সাল। আমার মা-বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাকে বকাবকি ও মারধোর করে। এক ঈদের দিনে ওর সাথে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার ছোটভাই আমাদের একসাথে দেখে ফেলে এবং বাবা-মাকে বলে দেয়। মা-বাবা অনেক রেগে ছিল। বাসায় ফেরার পর আমাকে তারা অনেক মারে, সেই ঈদের দিনেও। এমনকি ব্লেড নিয়ে এসেছিলো আমার গাল কেটে দিতে, বটি নিয়েছিলো কোপ দেওয়ার জন্য। এরপর থেকে তা নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সেই ছেলেটির জন্য আমি জীবনে প্রচুর মার খেয়েছি। এমনকি মাথায় ও পায়ে দুইবার কোপও খেয়েছি। তবুও আমি তার সাথে কথা বলতাম। সত্যি কথা বলতে কী আমার পরিবারের কেউ আমায় ভালোবাসেনা। আমার ভাইরা অনেকবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো।

একদিন আমরা দু'জনে পাশের বেড়িবাঁধের দিকে গিয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় পাশের একটি রাজনৈতিক দলের ক্লাবঘর থেকে কয়েকজন লোক আমাদের ঘিরে ধরে এবং খুবই খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে। আমাদের গালিগালাজ করে এবং জোর করে তাদের অফিসে নিয়ে যায়। তারা খুবই রূঢ় ব্যবহার করছিল এবং এতো বাজে আচরণ করছিল যা আমি বলতে পারব না। তারা আমাদের পরিচয় জানতে চায় এবং দেবার পরও বারবার অনেক টাকা চাইছিল এবং এক পর্যায়ে আমাদের বাড়ির লোকদের খবর দেয়। আমাদের পরিবারের লোকেরা এলে তারা আবারও টাকা চাইতে থাকে এবং বলে যে টাকা না দিলে আমাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবে। সেই ক্লাবঘরের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর সেখানেই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়। আমি তখন মাত্র নবম শ্রেণিতে পড়ি। এই ঘটনার পরে আমি এক সপ্তাহ স্কুলে যাইনি। একদিন আমার এক সহপাঠী বাসায় এলো এবং বলল যে আমার শ্রেণি শিক্ষিকা ক্লাসে সবার সামনে আমাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে আমার মত মেয়েদের সাথে এমনই হওয়া উচিৎ। অনুপস্থিত সহপাঠীকে শিক্ষিকার দ্বারা এভাবে অপমাণিত হতে দেখে ক্লাসের সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো ।

এ ঘটনা শুনে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। আমার বাড়ির কেউ আমাকে স্কুলে যেতে বলে না আর। আমি আমার বাড়িতে থাকতাম, আর ছেলেটি তার নিজের বাড়িতে। তার মা এই বিয়ে মেনে নেননি এবং আমাকেও কোনোদিন গ্রহণ করেননি, কেননা আমাদের চাইতে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিলেন। তাই ছেলেটি নিজের পড়া আর অন্যান্য কাজ চালিয়ে যেতে পারলেও, আমাকে ঘরে-বাইরে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। আমার জীবন আর সহজ ছিল না, নিজের জীবনের নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়াতে এবং তার ও তার পরিবারের সাথে মানিয়ে নিতেও পারছিলাম না।

একদিন আমার সাথে বেসরকারি সংগঠন আরবান-এর এক কর্মীর দেখা হয়, আমি তাকে আমার কষ্টের কথা খুলে বলি যে, তিন বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও ছেলের পরিবার আমাকে মেনে নেয়নি। বরং আমার পরিবার চায় আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব দায়িত্ব নেই কিন্তু আমার শাশুড়ি একেবারেই এর বিরুদ্ধে। তারা যেহেতু আমার সাথে ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাই তারা কোনদিনও আমাকে ছেলের বউ হিসেবে মেনে নেননি। তারা মনে করতেন তাদের পরিবারের জন্য এটা লজ্জাজনক। তাই তারা আমাকে তাদের বাড়িতে কোনদিনই স্বাগত জানাননি, ফলে আমার জন্য তাদের বাড়ি যাওয়া ছিলো অসম্ভব। এছাড়াও, ঐ সময়ে আমি এমন দায়দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মানসিকতাও এমন ছিলোনা, তাই আমিও মানতে পারিনি। আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইছিলাম পড়া শেষ করবার জন্য। আমার মা আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দিতেন না, তাই আমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। ছেলেটির সাথেও সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হচ্ছিল আর আমি বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছিলাম। এই সময় আরবান-এর একজন এনজিও কর্মী আমার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন, উনি আমার শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অনুমতিও নিশ্চিত করেন। অনেক তর্কাতর্কির পরে আমার পরিবার সম্মত হয় এবং আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।"

জাহানারার কেস থেকে - জেন্ডার বৈষম্য, নারীর অধস্তনতা, সহিংসতা, পিতৃতান্ত্রিকতার মতো কয়েকটি সামাজিক রীতির বিষয়গুলো উঠে এসেছে। দলীয় আলোচনায় জেন্ডার বিষয়টি বারবার উপস্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েরা জেন্ডার ব্যাপারটি কীভাবে দেখে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তা আলোচনা হয়েছে। কেউ যদি প্রচলিত এই সব রীতি রেওয়াজ ভঙ্গ করে, তাকে চড়া মূল্য দিতে হয়। অনেকসময় সে মূল্য এতো বেশি হয় যে একটা মানুষের জীবনই পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্যদিকে জাহানারার কাহিনীটি একজন কমিউনিটি কর্মীর সহায়তায় সমস্যার সমাধান এবং নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা যখন সামাজিক রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার কথা বলি, এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩.১.২ শিক্ষা

যখন জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কথা হচ্ছিল, দল সদস্যরা তখন উল্লেখ করে যে মা-বাবারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে চান না। তারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেই মেয়েদের ওপর বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। দলের সদস্যরা বলে যে যদিও তারা অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা পেতে চায়, আরও পড়তে চায় কিন্তু তাদের মা-বাবারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের জন্য অসম্ভব চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। মা-বাবারা এখনও ভাবেন যে মেয়েকে বেশি পড়ালে সে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে এবং তার জন্য কোনো যোগ্য পাত্র পাওয়া যাবে না, যদি যোগ্য পাত্র পাওয়াও যায় তাহলে তাদেরকে পাত্রর পেছনে অনেক খরচ করতে হবে। যদিও মেয়েরা সেটা মনে করে না। তারা মনে করে তাদেরকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিলে তারা নিজেরাই যথাযথ জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে পারবে। এছাড়াও, তারা মনে করে যে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চাইলে উচ্চশিক্ষা অবশ্যই দরকার নইলে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। এইসব কিশোরীরা মনে করে যে তাদের মা-বাবাদের এমন মনোভাবের উৎস মূলত জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে।

নিজেদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পরে এই প্রসঙ্গে তারা যেসব সমাধান তুলে এনেছে, তা হলো:

১. মা-বাবাদের সন্তানদেরকে আরও সময় দিতে হবে
২. সবকিছু নিয়ে তাদেরকে সন্তানদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে
৩. তাদের উচিত সন্তানদের মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া
৪. নারীশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া
৫. মেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা দিতে হবে
৬. মেয়েদের উচিত নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অল্প বয়সে বিয়ে না করে লেখাপড়ায় মন দেওয়া, যেন তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আজিমপুরের দলটি আলোচনা করে 'নারী শিক্ষায় নিরুৎসাহ' শীর্ষক অন্যতম বিষয় নিয়ে। তাদের আলোচনা মোতাবেক এই সমস্যার পেছনে মূল কারণ হলো দারিদ্র, নিরক্ষর মা-বাবাদের অসচেতনতা, উত্ত্যক্ত করা, প্রেম এবং মেয়েদের দুর্বল ভাবা। আর এই শিক্ষার অভাব মেয়েদের ক্ষমতায়নের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধক। তারা এই বিষয়ে আরও কিছু নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করে, যেমন : বিভিন্ন সুবিধা/অধিকার/সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, আরও ভালো কাজ/বেতন প্রত্যাখ্যাত হওয়া, বৈষম্য, নির্ভরশীলতা, সম্মানের অভাব, দৈনিক জীবন যাপনে সমস্যা, বাল্যবিবাহ, কম্পিউটার শিক্ষায় সমস্যা, আধুনিক জীবনের সাথে খাপ খাওয়ানোতে সমস্যা এবং কোনো স্বপ্ন বা দূরদর্শিতার অভাব। এভাবে দলের সদস্যরা নারী শিক্ষার প্রসার হলে যে ধরনের সুবিধা হতে পারে তাও উল্লেখ করেছে। সেগুলো হলো : উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, দৈনিক সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা, অপরের সম্মান লাভ, ভালোভাবে পরিবার ব্যবস্থাপনা, নিজেদের এবং পারিবারিক হিসাব সামলানো, মানসিক ইতিবাচকতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সক্ষমতা, মানবাধিকার সংবেদনশীলতা, স্বাস্থ্য/পরিচ্ছন্নতা নিয়ে জ্ঞান, ডিজিটাল যন্ত্রাদি (কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট) ব্যবহারে সক্ষমতা, সামাজিক রীতি মানা, বিদেশে অভিবাসন করা, দায়িত্বশীল নাগরিক হবার সম্ভাবনা এবং দূরদর্শী হওয়া। এগুলো দলের সদস্যদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। পরবর্তীতে নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধ করার সমাধান বের করা হয়: মা-বাবাদেরকে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে সংবেদনশীল করে তোলা, নারী শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল করে তোলা, আর্থিকভাবে নারীদের সাহায্যকারী এনজিও এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বের করা। যেসব মেয়েদের আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন তাদের সাথে সেসব প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া, মেয়েদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, মা-বাবা ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক দৈন্য দূর করা এবং উত্ত্যক্ত করা প্রতিরোধ করা।

নিবিড় আলোচনার পরে দলের সদস্যরা দুটো কাজের পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয় দুটি ভিন্ন দলের সাথে : অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। কাজগুলো এমন :

১. **শিক্ষার্থীদের সাথে :** প্রতিটি দলের সদস্য তাদের সহপাঠী/বান্ধবী/প্রতিবেশী যারা এমন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বা আছে তাদের সাথে আলাপ করার দায়িত্ব নেয়। এছাড়াও তারা অপরাজেয় বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্রের ৪র্থ ও ৫ম শেণির শিক্ষার্থীদের সাথে কথাবলার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করার জন্য।
২. **অভিভাবকদের সাথে :** দলের সদস্যরা এবি শিক্ষা কেন্দ্রের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। এবি শিক্ষা কেন্দ্রে দেখা গেছে যে ৫ম শ্রেণীর পরে অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। তাই এই নির্বাচিত শ্রেণির অভিভাবকদের সাথে নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যেখানে অনেক পরিবার ভাড়া থাকে এমন একটি আবাসন এলাকা অভিভাবকদের সাথে আলোচনার স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

উপরের কাজগুলো করার জন্য দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নারী শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'জন গণগবেষককে নির্বাচন করে।

প্রথম কাজটি করবার সময় দলের সদস্যরা আলাদাভাবে ৯জন কিশোরীর সবার (এরা নিয়মিত শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে) সাথে আলাদাভাবে কথা বলেছে তাদের বর্তমান অবস্থা এবং এর পেছনের অন্তর্নিহিত কারণ জানার জন্য। মূল কারণগুলো হলো : বাল্যবিবাহ, প্রেম/সম্পর্ক, লেখাপড়ায় আগ্রহ না থাকা, অসচেতন মা-বাবা, কিশোরী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী/আত্মীয়দের বিয়ের চাপ, অসচেতন শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেশাসক্তি, নিম্নমানের শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি। এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে দল সদস্যরা একটা তালিকা তৈরি করে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জানায় 'নারী শিক্ষায় নিরুৎসাহিত করা' প্রসঙ্গে তাদের সচেতন করার জন্য। এছাড়া, সদস্যরা যেসব কিশোর-কিশোরীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদের ওপর কেস স্টাডি তৈরি করেছে।

আজিমপুরে একটি দলীয় বৈঠক চলাকালীন একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় উঠে আসে। দল সদস্যরা উপলব্ধি করে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তিতে একটা দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, দল সদস্যরা পড়ার মান ভালো করার জন্য এককভাবে যা করা যায় তার ওপর জোর দেয়। গভীর আলোচনার পরে তারা প্রত্যেকে নিজেদের জন্য প্রযোজ্য লেখাপড়ার খসড়া দৈনিক রুটিন তৈরি করে এবং আবিষ্কার করে যে তারা অনেক কম সময় পড়ে, যেহেতু তাদের অধিকাংশের বাসগৃহে সবার জন্য একটি মাত্র ঘর থাকে। সেখানেই টেলিভিশন দেখা ছাড়াও সাংসারিক যাবতীয় কর্মকান্ড চলে। তাই কোলাহলের মধ্যে তাদেরকে পড়াশোনা করতে হয়। তাদের উদ্বুদ্ধ করার কেউ নেই, কেউ তাদের দেখে না (মা-বাবা বা শিক্ষক), ফলে তারা ক্রমশ : টেলিভিশন দেখায় আসক্ত হয়ে গেছে। এসব বিবেচনা করে তারাও কিছু সিদ্ধান্ত নেয় :

১. একটি পড়াশোনার দৈনিক রুটিন তৈরি করে তা মেনে চলা
২. সহপাঠীদের নিয়ে একটি পড়ার দল সংগঠন করা
৩. যেহেতু অংক সবচাইতে কঠিন বিষয়, এটার জন্য প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট সময় দেয়া
৪. পড়ার বইয়ের বাইরেও অন্যান্য বই পড়া

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক, দলের সদস্যরা প্রতিদিনকার পড়ার রুটিন তৈরি করে এবং সেই রুটিন অনুসরণ করে তারা আরও ভালোভাবে সময় ব্যবহার করে। তারা টিভি দেখার সময়ও কমিয়ে দেয় এবং তা পড়ায় কাজে লাগায়। এর ফলে তারা জানায় যে, তাদের লেখাপড়ার মান উন্নত হচ্ছে। এসব ইতিবাচক ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করে দলের নারী শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়।

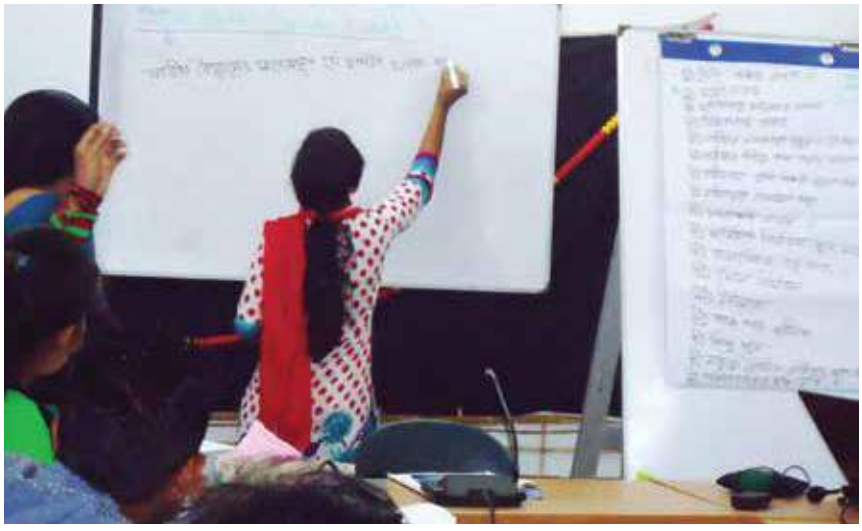

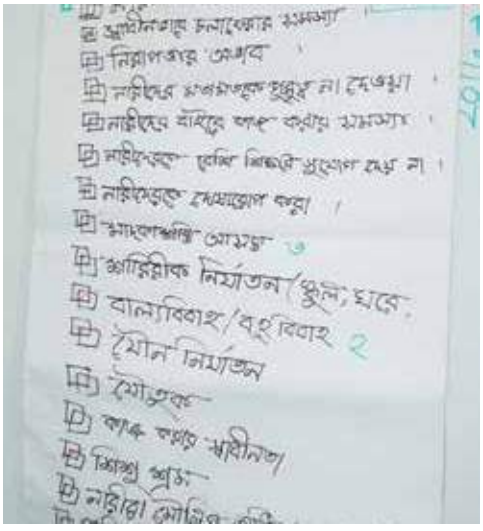

চিত্র : কর্মশালায় বাউনিয়া বাঁধ গণগবেষকদের এলাকাভিত্তিক জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ

৩.১.৩ ছেলে ও মেয়ের মধ্যেকার বৈষম্য

মোহাম্মদপুর দলের সদস্যরা ছেলে ও মেয়ের বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেকার বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা শুরু করে। তাদের আলোচনা অনুসারে বৈষম্য ঘটে পরিবারে, সমাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক সমস্যা, মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, সাংস্কৃতিক রীতি হচ্ছে এর পেছনের প্রধান কারণ। তবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা কয়েকটি দিক ঠিক করে : মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিদ্বেষ ভাঙা, ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা, সেই সাথে দুই পক্ষের জন্য স্বাধীনতার গুরুত্বকে বোঝা।

অনেক এনজিও জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে। প্রতিদিনকার বৈষম্যের বিষয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে, তবে এই হার সন্তোষজনক নয়। অপরপক্ষে অনেকে আছেন যারা বলেন তারা সচেতন, কিন্তু বাস্তবে নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য খুব কমই কিছু করেন। বাউনিয়া-বাঁধের এমন একটি ঘটনা এখানে দেয়া হলো:

কেস : 'পরিবারে বৈষম্য'

এটি সাধারণ একটি হাসিখুশি পরিবারের ঘটনা। তারা বিত্তবান না কিন্তু স্বচ্ছল, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই। তাদের দু'টি সন্তান, মেয়ে শাহানা (ছদ্মনাম) বড়, ভাই ছোট। মা-বাবা দুইজনকেই ভালোবাসেন। মাধ্যমিক শেষ হবার পরে মেয়েটি উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে চাইলে তাকে বলা হয় যে মেয়েদের এত বেশি পড়ার দরকার নেই, মেয়েরা এত পড়ালেখা করে না। তবে মেয়েটি অনেক জেদি ছিল এবং স্থানীয় একটি এনজিও-র সচেতনতা কর্মসূচির সাথে জড়িত ছিল। প্রথমে সে বাবা-মাকে ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কাজ হয় না। পরে সে অনেক লড়াই করে মা-বাবার সাথে, অনেক কান্নাকাটি করে এবং দুই দিন না খেয়ে থাকে। শেষে তার মা-বাবা রাজি হয় এবং সে একটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হবার পর সে উচ্চ শিক্ষার্থে আবারও ভর্তি হতে চায়। এবার আবারও তাকে মানা করা হয়। তার মা-বাবা চায় সে যেন বিয়ে করে কারণ সে মেয়ে, তাই সে রোজগার করে সংসারে দিতে পারবে না। কিন্তু তাদের টাকা জমাতে হবে ভাইয়ের জন্য। তারা যুক্তি দেয় যে ভাইয়ের একটা ভালো চাকরি দরকার, সে সংসারের দায়িত্ব নেবে সুতরাং তাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

শাহানার কোনো স্বাধীনতা নেই। সে যখনই বন্ধুদের বাসায় যেতে চায়, তার মা অনুমতি দেয় না। শাহানা এবং তার মা যথেষ্ট খোলামেলা ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব ছিল। যখনই সে বাইরে যেতে চেয়েছে, মা তাকে বলেছেন যে তার মতো অল্প বয়সী মেয়েরা এত বাইরে বাইরে ঘোরা ঠিক না, প্রতিবেশীরা নানান কথা বলবে। অন্যদিকে তার ভাই মাত্র দশম শ্রেণিতে পড়ে, তার চেয়ে বয়সে ছোট, এখনও কিশোর, কিন্তু সে যেখানে যখন খুশি যেতে পারে। অনেকসময় মা-বাবাকে কোথায় যাচ্ছে বলারও দরকার মনে করে না। আর তাকে কোনো কারণও দর্শাতে হয় না এজন্য।

অভিভাবকদের একটি বৈঠকে শাহানার মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মেয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন যে, মেয়েকে যতদূর পড়তে চায় পড়তে দেবেন, কিন্তু তার কথায় বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না।

শাহানা অনেক উজ্জ্বল একটি মেয়ে, প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময়। সে শিখতে চায়, তার খোলা ও অনুসন্ধিৎসু মন আছে, যার কারণে সে দলের অ্যানিমেটর হতে পেরেছে। পেরেছে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হতে। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে এবং তার মা-বাবা মনের মধ্যে চিরাচরিত মূল্যবোধকে জিইয়ে রাখার ফলে এই সমস্ত সম্ভাবনা এবং বুদ্ধিমত্তা অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যাবার যোগাড় হয়। শাহানার ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, বিত্তহীনতা নয়, স্বচ্ছল পরিবারেও জেন্ডার বৈষম্য করা হয়।

৩.১.৪ পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ

রায়েরবাজারের গণগবেষণা দল পিতা-মাতার বিচ্ছেদকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, কেননা এই দলের কিছু সদস্যের ওপর মা-বাবার বিচ্ছেদের খারাপ প্রভাব পড়েছিল এবং ভুক্তভোগী ছিল। তারা সবসময় নিজেদের জীবনে বাবার অনুপস্থিতি অনুভব করত, সেই সঙ্গে তাদের মায়ের জীবনে স্বামীর অনুপস্থিতি। তারা এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রমাণ বয়ে বেড়ায় যে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ ও মতামত পরিবারে অনেক বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং শেষে এর ফলে বিয়ে বিচ্ছেদও হতে পারে। একজন পুরুষ অতি সহজেই রেগে যেতে পারে এবং তার জন্য কোন দায়দায়িত্ব বা ফলাফলের তোয়াক্কা না করে পুরো পরিবার ফেলে চলে যাওয়া তার পক্ষে সহজ। সন্তানদের ওপর এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়, কারণ এর ফলে পারিপার্শ্বিকতায় তারা অসম্মানিত হতে পারে এবং বন্ধুদের কাছে হাসি-তামাশার পাত্র হতে পারে, যা থেকে তাদের মধ্যে সামাজিক নিঃসঙ্গতা আসে। এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনা করার পরে দলের সদস্যরা কিছু প্রাথমিক কারণ বের করে এবং একটি বিবাহ বিচ্ছেদের কেস স্টাডি করে। নীচে তার বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

কেস: 'ভালোবাসা: কীভাবে একটি স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপে'

রোজিনা ও বেলাল নিজেদের পছন্দে বিয়ে করে জীবন শুরু করে। রোজিনার তিনটি মেয়ে হয়, যা তার স্বামী একদমই পছন্দ করেনি, কেননা সে আশা করেছিল ছেলে হবে। যদিও তারা দু'জনেই কাজ করত, কিন্তু তাদের জন্য ঘরের খরচ চালানো মুশকিল ছিল, কারণ বেলাল তার আয় বাইরে খরচ করত। এমনকি সে প্রতিবেশীর থেকে ধার নিয়ে পুরোটাই খরচ করে ফেলেছিল। তারপর রোজিনাকে চাপ দিত তার আয় থেকে ধার শোধ করে দেবার জন্য। এই অবস্থায় তাদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হত, তারপর বেলাল রোজিনাকে অর্থাভাবের কথা বলে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সে বিয়ে না করেই আরেকজন নারীর সাথে থাকা শুরু করে। এ কথা জানতে পেরে রোজিনা গ্রাম থেকে ফিরে আসে এবং স্বামীকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সেই মহিলা চলে যায় আর বেলাল অনিয়মিতভাবে বাড়ি ফিরতে থাকে। এমতাবস্থায় ঋণদাতারা বাড়িতে আসে এবং রোজিনাকে বেলালের ঋণ শোধ করতে চাপ দেয়। এর কিছুদিন পরে বেলাল রোজিনা ও তাদের মেয়েদের ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে শুরু করে। রোজিনা তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কারণ বেলাল তার ফোন ধরেনা। রোজিনা তখন অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে। বেলাল যখন বুঝতে পারে যে রোজিনা তাকে খুঁজছে, সে লাইন কেটে দেয়। রোজিনা বর্তমানে অসহনীয় জীবনযাপন করছে তিনটি বাচ্চা নিয়ে এবং তৈরি পোষাক কারখানা থেকে তার যৎসামান্য আয় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে।

দল সদস্যরা এর মধ্যে কতগুলো অসম ব্যপার লক্ষ্য করে। শ্রমবিভাজন আর নারীর প্রতি সম্মানের অভাব, প্রাথমিক মতভেদ ও পুরুষ আধিপত্য এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী। আর একটি জীবন কাহিনী থেকে, একজন দল সদস্য তুলে আনেন যে একজন পুরুষ ক্ষুদ্র ঋণ নেয় তারপর ঋণ শোধ করার আগেই বিয়ে বিচ্ছেদ করে। যখন সে উধাও হয়ে যায়, সন্তানের বাবা বলে কেউ থাকেনা এবং স্ত্রী ক্ষুদ্র ঋণ শোধ করতে বাধ্য হয়।

এই আলোচনার পরে, রায়েরবাজার এবি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে সন্তানদের জীবনে তাদের ভূমিকা আলোচনার জন্য গবেষকরা একটা বৈঠক ডাকে। অভিভাবকদের সাথে বৈঠকে তারা মা-বাবাদের দায়িত্বের একটি তালিকা তৈরি করে ও একটি নাটকের খসড়া করে বিয়ে বিচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে।। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আলোকিত হয়, কারণ তারা বুঝতে পারে পারিবারিক স্তরে কীভাবে জেন্ডার বৈষম্য দেখা যায় এবং কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া, কিশোর-কিশোরীরা আলোচনা করে যে তারা যখন মা-বাবা হবে, তখন তারা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনে বিদ্যমান অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন আনবে।

৩.১.৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে, যা দলের বৈঠকেও উঠে আসে। ক্ষমতা এমনভাবে বন্টিত হয় যেখানে পুরুষ সিদ্ধান্ত নেয় ও নারীরা তা পালন করে। তবে সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু খুবই ধীরে। এই পরিবর্তন নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে প্রায় চোখেই পড়ে না। যদি কোন নারী সিদ্ধান্ত নিতে চায়, সমাজ তাকে রূঢ় সমালোচনার মাধ্যমে অপমানিত করে। মাহী আক্তারের কেস স্টাডিটি এর একটি ভাল উদাহরণ:

কেস: 'পরিবারের মধ্যে ক্ষমতায়নের সংগ্রাম'

মাহী আক্তার বাউনিয়া বাঁধ এলাকার সি ব্লকে থাকে। সে নবম শ্রেণিতে পড়ে এবং এই অল্প বয়সেই বিবাহিতা। সে পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই বিয়ে করেছে। তার ভাষ্যমতে, 'প্রেমে পড়া কোনো অপরাধ নয়। যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে, কিন্তু আমার পরিবারের মতে এটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

কিছুদিন আগের কথা। তার একটি প্রেমের সম্পর্ক ছিল, যখন তার পরিবার আঁচ করতে পারল, তারা রুখে দাঁড়াল। তারা সবসময় তাকে বকত, অনেকবার মেরেছে। তার কথা কেউ শুনতে চায়নি, কেউ তাকে বুঝতে চায়নি। পরিবারের সবার মধ্যে থেকেও মাহী একা বোধ করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল পরিবার বলতে তার কেউ নেই। মাহী বলে, "আমি যখন স্কুলে যেতাম, নিজেকে মুক্ত পাখি মনে হত। আবার যখন ফিরে আসতাম, মনে হত খাঁচার পাখি। অনেকে আমাকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিত, কিন্তু আমি আমার মা-বাবার লোকলজ্জার কারণ হতে চাইনি। এক পর্যায়ে আমার বাবা চাইতে লাগলেন যেন আমি আমার প্রেমিককে বিয়ে করি। তারা বুঝতে পারছিল না যে, আমার একজনের সাথে সম্পর্ক আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি তাকেই বিয়ে করতে চাই। বিয়ে একটা সারাজীবনের ব্যাপার আর এটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার আগে আমার সে মানুষটাকে ভালোভাবে জানতে হবে ও তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু আমি সেসবের কোনো সুযোই পাইনি। বাধ্য হয়ে আমাকে তাকেই বিয়ে করতে হয়েছে।"

যদি কোনো নারী নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তার সমাজের সাথে লড়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু যদি কোনো নারী সেই ক্ষমতা গড়ে উঠবার আগেই বিয়ে করে, তাহলে তার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশ নেয়া অসম্ভব হয় আর পুরুষরা সেই সুযোগটা নিয়ে নেয়। মাহী আক্তার বলে : "৫-৬ মাস আগে আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে যেতে বলা হয়েছিল। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই একই ব্লকে থাকে তাদের মতো। দুই বাড়িই (আমার বাবার ও আমার স্বামীর) নিমন্ত্রণ ছিল সে বিয়েতে। কিন্তু যেদিন অনুষ্ঠান, আমার মামাকে নিয়ে আমাদের একটা পারিবারিক ঝামেলা হলো আর সে কারণে আমার খুব মন খারাপ ছিল তাই আমি ঠিক করলাম পরেরদিন আমি ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যাব না। কিন্তু পরেরদিন আমার ভাশুর বাড়ি এসে আমাকে তৈরি হতে বলে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য, আমি না করি। একটু পরে তার স্ত্রী এসে একই কথা বলে। তারপর আমার স্বামী আসে এবং সেও চাপাচাপি করতে থাকে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য। এই নিয়ে আমাদের মাঝে তর্ক হয় এবং আমরা ঝগড়া করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমার স্বামী কয়েকটা আমাকে থাপ্পড় মারে। এরপর আমি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেই। আমরা তিন মাস কথা বলিনি। এই সময়টায় সে আমার কাছে বারবার ক্ষমা চায় এবং শেষে আমি তাকে মাফ করে দেই। এখানে যে বিষয়টা আমার খারাপ লেগেছে তা হলো, আমি অনুষ্ঠানে যাব কি যাব না সেটা তো সম্পূর্ণ আমার সিদ্ধান্ত ছিল। তারা আমার ওপর তাদের সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।"

পরিবার প্রতিষ্ঠানটি অনেক সময় ব্যবহৃত হয় জেন্ডার বৈষম্যকে সিদ্ধ করতে ও বজায় রাখতে, কিন্তু এটাই আবার এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রথম জায়গা। এই নতুন প্রজন্মের অ্যানিমেটরদের মধ্যে এখন পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়েছে এবং কৌশলগতভাবে এই নিয়ে কাজ করতে তারা বদ্ধপরিকর। তবে তারা তাদের পরিবারের ছেলেদের সমান মর্যাদা পায় না।

৩.১.৬ জেন্ডার ও রীতি

যেহেতু সমাজ জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া - যা পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করে না সমাজের তৈরি 'ভালো মেয়ে','খারাপ মেয়ে'-র চিরাচরিত ভাবনার প্রাচীন সংজ্ঞা । এটি অতি চমৎকারভাবে একটি গণগবেষণা বৈঠকে বর্ণনা করা হয়েছে। বাউনিয়া-বাঁধের একটি দলীয় বৈঠকের সময় তরুণ অ্যানিমেটররা একটি তুলনামূলক গবেষণা করে সমাজে 'ভাল মেয়ে','খারাপ মেয়ে'-র ধারণা বিষয়ে। ফলাফল অনেকটা নিচের টেমপ্লেটের মতো :

	ভালোমেয়ে	খারাপ মেয়ে
১.	বড়দের কথা শোনে	নিজেদের বিচারবুদ্ধিতে চলে
২.	সবসময় বাড়িতে থাকে	বাইরে থাকতে পছন্দ করে
৩.	সন্ধ্যার পর বাইরে থাকে না	সন্ধ্যার পর বাইরে থাকে
৪.	বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারে না	বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে সারাক্ষণই বাইরে যায়
৫.	তাদের কোনো পুরুষ বন্ধু থাকে না	তাদের একাধিক পুরুষ বন্ধু থাকে
৬.	তারা প্রেমে পড়ে না বা প্রেম করে না	তারা প্রেম করে
৭.	কম কথা বলে	তারা বাচাল
৮.	তারা বড়দের সাথে তর্ক করে না	তারা যুক্তি দিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা বলে, এমনকি বড়দের সামনেও

এই ছক পূর্ণ হবার পরে, সিদ্ধান্ত হয় যে আলোচনার মাধ্যমে তরুণ অ্যানিমেটররা এই দুই বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে। আলোচনা হয়ে যাবার পরে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি মেয়েরই চলাফেরার এবং বাক স্বাধীনতা আছে। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার যা সংবিধানে নিশ্চিত হয়েছে। তাই মেয়েরাও যে এই অধিকারকে উপভোগ করবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। যদিও আমাদের সমাজ এর বিরুদ্ধে। তাই এসব বৈশিষ্ট্য স্বতঃসিদ্ধ নয়, পরিবর্তনশীল।

একজন গণগবেষক বলে যে, "আমি স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে চাই কিন্তু আমার বাবা দিতে চান না। আমি যখনই কোথাও যেতে চাই তিনি আমার ছোট বোনকে আমার সাথে দেন। ওর পক্ষে তো সম্ভব নয় আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাই এর পেছনে অন্য কারণ আছে। হয়তো তারা আমাকে বিশ্বাস করেন না বা আমার ভালোর জন্য এটা তাদের কৌশল। তারা আমার নিজস্ব স্বাধীনতা নিয়েও ভাবেন না। আমার মা আমার স্বাধীনভাবে ঘোরার তারিফ করেন, কিন্তু বাবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ নিতে দেন না।"

তারা মত দেয় যে মেয়েদের উচিত কোনো ছেলের মতোই নিজের মনের কথা বলা, যদি সে চায়। মেয়েদের মা-বাবাদের সামনে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করার অধিকার আছে। আদুরী নামের আরেকজন গণগবেষক এই পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করে : "বেশিরভাগ পারিবারিক আলোচনায় আমি অংশ নিতে পারি না। আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে পরিবারের কিছু কিছু ব্যপারে বলে কিন্তু আমার মতামতের তোয়াক্কা না করেই অনেক সিদ্ধান্ত নেয়।" তাছাড়াও, কোনো মেয়ে দরকার পড়লে রাতে বাইরে যেতে পারে। তার মানে সে মেয়ে 'খারাপ' নয়।

তারা আরও মনে করে যে প্রতিটি মেয়েকে প্রথমে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সমাজ সবসময় বিদ্যমান সামাজিক অনুশাসন না মানা একটি মেয়েকে 'খারাপ' শ্রেণিভুক্ত করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা খারাপ নয়। অনেকেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। তারা শুধু নিজেদের মত করে জীবনযাপন করে; সেটা হয়তো অন্যরকম, তবে সেটা যে 'খারাপ' তা নয়। যেমন, যৌনকর্মীদের সমাজে বিবেচনা করা হয় নিম্নস্তরের, অচ্ছুৎ। যদিও, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এ পেশায় এসেছে পুরুষ-শাসিত সমাজের চাপে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে। তাই নারীদের শুধু দোষ দিলেই চলবে না। সমাজে শুধু মেয়েদের দোষ দেবার একটি প্রবণতা বিরাজমান আছে। সব কিছুর জন্য নারীদেরই দায়ী করা উচিত নয়। এই ক্রমাগত দোষ দেওয়া হচ্ছে চিরাচরিত জেন্ডার মূল্যবোধের ফল।

বিবাহ সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পরিবর্তন নিয়েও তারা আলোচনা করে। যদিও অধিকাংশই বলেছে যে, তাদের হয়তো বিয়ে করতে হবে পরিবারের চাপে, সমাজ, বন্ধুদের চাপে এবং আবেগগত কারণে। কিন্তু তাদের মতে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, অপেক্ষা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা বেশি-রভাগই চায় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করার পর বিয়ে করতে, অথবা একটি ভালো চাকরি পাবার পরে, যখন তারা স্বাবলম্বী হবে। যদিও দলের বেশিরভাগ মেয়ে পরিবার থেকে চাপের মুখে আছে বিয়ের জন্য, কিন্তু তারা এখন মানসিকভাবে তৈরি নয়। এটা তাদের মনোভাবের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। হয়তো এই মনোভাব তাদের ভেতরে আগে থেকেই ছিলো কিন্তু তারা এখন নিজেদের এমন চিন্তার পেছনে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারছে। যুক্তিবদ্ধ চিন্তার এই পরিবর্তনটি গণগবেষণার দলীয় আলোচনার ফলাফল। তারা এ স্বপ্ন পূরণ করতে চায় একটি ভালো চাকরি জোগাড় করে আর উপার্জন করে, যা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন তারা শিক্ষিত হবে।

৩.১.৭ নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'ক্লাসিক পিতৃতান্ত্রিক' বেল্ট হিসেবে, যা উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বেল্টে সামাজিক কাঠামোটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীর আচরণ চরমভাবে বিধিনিষেধে আবদ্ধ। কঠিন জেন্ডার বিভাজন, বিশেষ ধরনের পরিবার ও রক্তসম্পর্ক এবং পরিবারের সম্মানের সাথে নারীর চরিত্রের তীব্র সংযোগ এসব সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নারী সদস্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে পুরুষরা পরিবারের সম্মান রক্ষার দায়ীত্ব পায়। এসব সমর্থিত হয় জটিল সামাজিক রীতি-নীতি দ্বারা, যা পুরুষদের ওপর নারীদের নিরাপত্তার নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে (কবীর ১৯৮৮)।

বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা এমন একটি বিষয় যা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে, বিশেষ করে যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মাত্রার ক্ষেত্রে। ২০১২ সালে বাংলাদেশের জনমিতিক ও স্বাস্থ্য জরিপ মোতাবেক ৮৭% বাংলাদেশী নারী ও মেয়েরা তাদের জীবদ্দশায় যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। ২০১৫ সালের মানবিক উন্নয়ন রিপোর্টে বাংলাদেশ জেন্ডার অসমতা ইনডেক্স-এ ১৮৮-র মধ্যে ১৪২ র‍্যাঙ্কে আছে (ইউএনডিপি ২০১৫)।

নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে কথা বলার সময় গণগবেষণা দলের সদস্যরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দেয় যেখানে কিশোরীরা আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। তারা আলোচনা করে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, স্ত্রীকে প্রহার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। তারা অন্যান্য কিশোরী মেয়েদের কেস স্টাডি সংগ্রহ করে। দলীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে এমন দু'টি কেস স্টাডি এখানে উপস্থাপিত হলো।

কেস স্টাডি : 'সহিংসতার লক্ষ্য নারী'

রিতা (ছদ্মনাম) তার প্রেমিককে বিয়ে করে একটি স্বপ্নের বিবাহিত জীবন শুরু করে। তবে বাস্তবের সাথে ধাক্কা খেয়ে তার স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসে। তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা তাকে কোনো সুযোগ পেলেই মারধোর করতো। রিতাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশীরা হস্তক্ষেপ করলে তারা তাদের সাথে ঝগড়া করতো। তার এমনকি মা-বাবার বাড়িতে যাবারও অনুমতি ছিল না। সে শিক্ষিত বলে ঘরে প্রাইভেট টিউশনি করে আয়ের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের খরচ চালাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার স্বামী সেটা করতে দেয়নি। স্বামী চিন্তা করেছিল সে যদি আয় করে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়, তাহলে তার পরিবার এবং তার কথা নাও শুনতে পারে। একজন নারী হিসেবে পরিবারের সিদ্ধান্ত নেবার ব্যপার তার কোনো ভূমিকা ছিল না। সমাজে বর্তমানে জেন্ডার পরিস্থিতি কেমন তা বোঝার জন্য গ্রুপ সদস্য সাবিনা এই কেস স্টাডিটি পরিচালনা করে ।

কেস স্টাডি : 'ঘরের চালে মোরগ: অপ্রত্যাশিত ঘটনা'

ষোল বছর বয়সী নাসরিন বাউনিয়া-বাঁধের সি ব্লকে থাকে। একদিন তার মোরগ দুপুরবেলা প্রতিবেশীর চালের ওপর উঠে জোরে জোরে ডাকতে থাকে. এতে প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে জেগে যায়। প্রতিবেশী রাজিয়া রেগে যায় আর নাসরিনের মাকে আজে বাজে কথা বলে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। অনেক গালিগালাজ বিনিময় হয়। নাসরিনের মা রেগে গিয়ে বলেন যে মোরগের আচরণে তাদের কোনো হাত নেই এবং যা ঘটেছে তা অনিচ্ছাকৃত। সে ঝগড়া এমন চরমে ওঠে যে এক সময়ে অন্যান্য প্রতিবেশীরা হস্তক্ষেপ করে। পরে ঝগড়া মিটে গেলেও সমস্যা মেটেনি। সেদিনই সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটার দিকে রাজিয়া কতিপয় ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়ে এসে নাসরিনদের বাড়ি আক্রমণ করে। তারা লাঠি আর চাপাতি নিয়ে এসেছিল, তারা নাসরিনদের ঘরের সমস্ত জিনিস ভাংচুর করে। নাসরিন-এর মা এবং তার দুই বোন ঘটনার সময় বাড়িতে ছিল। গুন্ডারা তিনজনকেই প্রচণ্ড মারধোর করে এবং নাসরিন কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে। সৌভাগ্যবশত নাসরিন তাদেরকে আগেই দেখতে পেয়েছিল ফলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং তার বাবাকে ফোন করার চেষ্টা করতে থাকে। বাবাকে ফোনে না পেয়ে সে স্থানীয় দু'টি ছেলেকে নিয়ে নিকটস্থ মাটিকাটা এলাকায় যায়, যেখানে তার বাবা ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করে এবং ভ্যানে করে হোসিয়ারি এবং অন্যান্য কাপড় বিক্রি করে। বাবাকে সে সব জানায় এবং সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে। ততক্ষণে ভাড়াটে গুণ্ডারা চলে গেছে এবং নাসরিনদের ঘরবাড়ির সমস্ত স্থান জুড়ে তাণ্ডব চালানোর ফলে লণ্ডভণ্ড অবস্থা ছিল। নাসরিনের মা ও দুই বোন ভয়ানকভাবে মারধোরের শিকার হয়ে মারাত্মক আহত হয়, তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে স্থানীয় মাতবরদের নিয়ে সালিশ বৈঠক বসে কিন্তু ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি কারণ দায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং গুণ্ডারা স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের পরিচিত ছিল এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। নাসরিন ও তার পরিবারকে চুপ থাকতে বলা হলো এবং তাদেরকে হুমকি দেয়া হলো যে তারা যদি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে ফলাফল খারাপ হবে।

পরে জানা গেল যে আক্রমণকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাসরিনকে অপহরণ করা, কিন্তু তাকে না পেয়ে তার পরিবারের সদস্যদেরকে মারধোর করা হয়েছে। যদি তাকে অপহরণ করতে পারত, সে হয়তো যৌন সহিংসতার শিকার হতো এবং আজীবনের জন্য তার পরিবারের বদনাম হতো। অনেকসময় দেখা যায় যে ঘটনা যাই হোক না কেনো নারীরাই হয় লক্ষ্যবস্তু। আমাদের সমাজে এটি এক ধরনের নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছে, কেননা নারীদের দুর্বল ভাবা হয়। এটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও দেখা গিয়েছিল, যখন পাকিস্তানী সেনারা আধিপত্য বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালী নারীকে ধর্ষণ করেছিল এবং আজ অব্দি অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

দলীয় আলোচনার সময় সদস্যরা আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে এমন একটি এনজিও - ব্লাস্ট-এর (বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট) একটি প্রকাশনা পাঠ করে এবং তারা জানতে পারে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে কী করতে হবে। যা করতে হবে : প্রথম পদক্ষেপে পরিচিত কাউকে ঘটনাটি জানাতে হবে যেন উক্ত ব্যক্তি সাক্ষীর ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের কাপড় সংরক্ষণ করবেন এবং স্নান করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না মেডিকেল পরীক্ষা হচ্ছে। আক্রান্ত বা অন্য যে কেউ সরাসরি বা ফোনযোগে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে খবর দিতে পারে। কোন কোন এলাকায় ভিকটিম সহায়তা কেন্দ্র আছে। তাছাড়া, ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতার কেসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পুরো ঘটনাটি যথাযথভাবে লিখে ফেলা যেন তা তদন্ত এবং বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে। শেষে এমন কেস দ্রুত শেষ করার জন্য আইনী উপায় আছে। দলের সদস্যরা প্রতিজ্ঞা করে যে এমন ধরনের ঘটনায় তারা উপরোক্ত পদক্ষেপ নেবে।

৩.১.৮ যৌন হয়রানি

দলের সদস্যরা কয়েকবার বসে এবং নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে যৌন সহিংসতা বিষয়ে নিজেদের ধারণা পরিষ্কার করে। মোহাম্মদপুর ও রায়ের বাজারের অংশগ্রহণকারীরা জহুরী মহল্লা ও রায়েরবাজারের ম্যাপ অংকন করে এবং সবচাইতে বেশি যৌন হয়রানির (মূলত উত্ত্যক্তকরণ) ঘটনা ঘটে এমন স্থান চিহ্নিত করে। মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব কারণ চিহ্নিত হয় : আধুনিক পোষাক পরা, অসংবেদনশীলতা, আইনের প্রয়োগহীনতা, এলাকার মানুষদের অসচেতনতা ইত্যাদি। ছেলেদের দৃষ্টিকোণ থেকে : কর্মহীনতা, অসচেতন পরিবার, কুসঙ্গ, কিশোরীদের প্রতিবাদহীনতা ইত্যাদি। তারা যৌন হয়রানির কিছু সামাজিক প্রভাবও চিহ্নিত করে : বাল্যবিবাহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে যাওয়া, স্বাধীনতা হ্রাস পাওয়া, প্রচণ্ড মানসিক চাপ, আত্মহত্যা ইত্যাদি। সমাধান হিসেবে চিহ্নিত হয়: কিশোর-কিশোরী, এলাকার ব্যক্তিবর্গ, আইনপ্রয়োগকারী এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে সংবেদনশীল করে তোলা দরকার। অনেক আলোচনার পরে এই কাজগুলোর পরিকল্পনা করা হয় : মেয়েদের সংবেদনশীল করে তোলার জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিতর্কের আয়োজন করা, স্থানীয় নেতৃত্বকে সংবেদনশীল করে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আইনপ্রয়োগকারীদের সংবেদনশীল করে তোলার জন্য তথ্য অধিকার আইনে (আরটিআই) আবেদন করা, স্থানীয় নেতাদের সাথে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করা এবং এলাকার ব্যক্তিবর্গদের সংবেদনশীল করার জন্য স্থানীয়ভাবে সদস্যরা নিজ উদ্যোগে র‍্যালী করে। মোহাম্মদপুর দলের একজন সদস্য সামিনা যৌন হয়রানি নিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের।

সামিনা নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে অনেক সময় বিদ্যালয়ে যাবার পথে কিশোর ছেলেদের থেকে যৌন হয়রানির শিকার হয়। তবে সে কখনও তাদের সাথে ভয়ে কথা বলেনি। একদিন তাদের মধ্যে একটি ছেলে তাকে ফুল দিয়ে প্রেম প্রস্তাব দেয়। সে তা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু ছেলেটি প্রস্তাবে সম্মত হতে তাকে চাপ দেয়। ছেলেটি এমনকি তার হাত ধরে বলে যে এছাড়া তার আর উপায় নেই। সামিনা কাঁদতে থাকে, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

দলীয় আলোচনা থেকে আরও জানা যায় যে আইন প্রয়োগকারীদের অসচেতনতাও ধারাবাহিক যৌন হয়রানির অন্যতম কারণ। তাই গবেষকরা ঠিক করে যে আরটিআই আবেদনপত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে, যেহেতু তারা সরাসরি তাদেরকে জানাতে ভয় পায়। তারা রিইব গবেষকদের কাছ থেকে আরটিআই নিয়ে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পায় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সংবেদনশীল করার জন্য জহুরী মহল্লার যৌন হয়রানির ঘটনার ওপরে দু'টি আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করে ।

যে সব কাজ নেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে, গণগবেষণা দলের সদস্যরা যৌন হয়রানির ওপরে একটি বিতর্ক সংগঠন করে মোহাম্মদপুরের গ্রিন লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়। গণগবেষণা দলের সদস্যরা অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করে ও তাদেরকে অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করতে বলে এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একজোট হতে বলে।

৩.১.৯ বিনোদনের অভাব

পল্লবীতে দলের সদস্যরা 'বিনোদনের অভাব' বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে। তারা ব্যাখ্যা করে যে বস্তি এলাকায় বেশিরভাগ উন্মুক্ত স্থান নেশাসক্তদের দখলে এবং খেলার জায়গাগুলো খেলা বা হাঁটার জন্য ব্যবহার করা যায় না। এটি অল্প বয়সীদের মধ্যে খুবই প্রভাব ফেলে। তাই স্থানীয় অ্যানিমেটররা অন্য সদস্যদের 'বিনোদন কী এবং বিনোদনের চাহিদা' শীর্ষক একটি রচনা লিখতে বলে। শাহীন নামক একজন বলে যে সে এবি শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে গান শিখলেও আর্থিক কারণে তার পক্ষে গান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গানকেই সে বিনোদন বলে ভাবে। আলোচনা করে দল সদস্যরা তাকে বলে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে নিতে যেখানে সে খরচটা চালাতে পারবে। আরেকজন সদস্য রোকেয়া, গানই তার আসল পছন্দ। কিন্তু পরিবারের কারণে তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। পরিবারের যুক্তি হচ্ছে, এখন সে গান শিখছে এবং বিভিন্ন জায়গায় পারফর্মও করবে। কিন্তু বিয়ের পর যদি স্বামী গান গাওয়া পছন্দ না করে তাহলে তো সংসার জীবনে সংঘাত সৃষ্টি হবে। তাই যদি ভবিষ্যতে স্বামী গান গাওয়া পছন্দ করে তখন শিখবে সে। এছাড়াও গান শেখার জন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন, তার বাবা তা দিতে পারবে না। দলের সদস্যরা এখানে জেন্ডার বৈষম্যের আভাস পায় এবং তাকে বলে সম্ভাব্য কোন উপায় বের করতে। দলের সদস্য আরেকটি মেয়ে, বই পড়তে পছন্দ করে, কিন্তু আর্থিক কারণে সে নতুন বই পায় না। দলের সদস্যরা লাইব্রেরির খোঁজ করতে মনস্থ করে, যেখান থেকে বই ধার নেয়া যাবে, যেহেতু বই পড়া মানে চেতনার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, যার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেতে পারে।

এছাড়া, দল সদস্যরা উপরের চ্যালেঞ্জগুলোর ক্ষেত্রে জেন্ডার দৃষ্টিকোণে কিছু তফাৎ চিহ্নিত করে। যদিও তারা একই সমস্যার মুখোমুখি (পরিবার গান গাওয়াকে সমর্থন করছে না), সেখানে কিছু ভিন্নতা আছে। একজন কিশোরী হিসেবে রোকেয়ার পরিবার তাকে সমর্থন করেনি সমাজে নিরাপত্তাহীনতার কারণে - যেহেতু গানের সাথে জড়িত থাকলে তাকে বিকেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হতে পারে। বিয়ের পর তার স্বামী এটা নাও মেনে নিতে পারে। অন্যদিকে শাহীনের এমন সমস্যা নেই। তার ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যাই প্রধান। তাই শাহীন বিনামূল্যে গান শেখা সম্ভব এমন প্রতিষ্ঠান খোঁজার সিদ্ধান্ত নেয়। আর রোকেয়া বাবাকে বোঝাবার নতুন কৌশল খোঁজার চেষ্টা করে।

এক সপ্তাহ পরে রোকেয়া জানায় যে সে সফলভাবে তার বাবাকে বোঝাতে পেরেছে এবং বাবা তাকে গান চালিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। তবে এর খরচ তাকেই দিতে হবে। শাহীন গণগবেষণা দলের থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ঠিক করে গানের ক্লাসের খরচের জন্য সে কোচিং ক্লাস খুলবে।

৩.১.১০ গৃহকর্মে শ্রম বিভাজন

গণগবেষণা দলের সদস্যরা অ্যাকশন হিসেবে শ্রমবিভাজনের ওপর আলোচনা করে এবং নিজেরা ঘরে কে কোনো কাজ করে তা-ও উল্লেখ করে। এই কাজটি করে মোহাম্মদপুর গণগবেষণা দল। আলোচনায় বের হয় যে মেয়েরা পড়ে ও ঘরের কাজ করে, যার মধ্যে

ঘর গুছানো, মেঝে পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া, বাজার করা, রান্না করা, রান্নাঘর ধোয়া ও মোছা। দলের অধিকাংশ মেয়েরই প্রায় দৈনিক কাজ এগুলো। অন্যদিকে দলের ছেলে তুহিন ও শরীফের জীবন অন্যরকম। তুহিন মা-বাবার বড় ছেলে। সে সকালে বিদ্যালয়ে যায়, বিকালে খেলে, একটি কোচিংয়ে যায় এবং পড়ে। এটাই তার রুটিন। প্রতিদিনকার রুটিনের এই পার্থক্য তাদের চোখ খুলে দেয়। এখন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা জেন্ডার ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে ।

৪. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য

গণগবেষণা দলের বৈঠকে আলোচিত চিহ্নিত জেন্ডার বিষয়গুলো এবং কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ঢাকার পাঁচটি নির্দিষ্ট বস্তিতে (প্রতি এলাকায় ২টি করে) দশটি এফজিডি পরিচালনা করা হয়। অভিভাবকেরা এবং স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ (শিক্ষক, এনজিও কর্মী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ) এই এফজিডি-তে অংশ নেয়।



চিত্র: পল্লবীতে স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে এফ জি ডি



চিত্র: আজিমপুরে অভিভাবকদের (মা) সাথে এফ জি ডি

৪.১ আলোচনার মূল বিষয়াবলী

আলোচনার মূল বিষয়গুলো এখানে এলাকার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বিবরণ দেয়া হলো।

- **স্বাস্থ্য :** জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে (৩-৫ জন একটি ঘরে থাকে এবং ৫-১০টি পরিবার একটি শৌচাগার ব্যবহার করে), বস্তি এলাকার বিশেষ করে কিশোরী মেয়েদের পক্ষে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা মুশকিল। বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীরা বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন নয় যেহেতু কেউ তাদের সাথে এ নিয়ে কথা বলে না। তাছাড়া এই বয়সের মেয়েরা এবং নারীরা যক্ষ্মাসহ অন্যান্য ভাইরাসে বেশি আক্রান্ত হয় যেহেতু তারা অনেক বেশি সময় ধরে বস্তি এবং তৈরি পোষাক কারখানায় গরম, অস্বাস্থ্যকর এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে থাকে। যক্ষ্মায় বেশি মেয়েরা ভোগে। এর কারণ হলো চিকিৎসার প্রাপ্যতা কম, তাদের জন্য কম খরচ করা হয় এবং পুষ্টির অভাব। উপসংহারে পৌঁছুতে আরও গবেষণার প্রয়োজন।
- **শিক্ষা :** বেশিরভাগ মা-বাবারা শিশু শিক্ষার বিষয়ে সচেতন। তবে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে অনেকেই আর্থিক সমস্যার মুখে পড়ে। ফলে কিশোর-কিশোরীরা আয়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে (যেমন- তৈরি পোষাক কারখানা এবং মালগুদামে কাজ, গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, রেস্তোরাঁ, যানবাহন ইত্যাদিতে কাজ)। তবে এবি ও আরবানের বিদ্যালয় সুবিধার বাইরে পল্লবীর একটি বিদ্যালয় কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুবিধা দিয়ে থাকে এবং একজন নারী শিক্ষক এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন।

- **কাজে বিভাজন :** কাজ হিসেবে গৃহস্থালি কাজ বিবেচিত হয় না, তাই কেউ গৃহিণীদের সম্মান করে না যদিও তাকে অনেক কাজ করতে হয়।

- **জীবিকা :** বস্তি এলাকায় যেসব পরিবার বাস করে তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। এছাড়া, তাদের অনেক খরচ করতে হয় চিকিৎসার জন্য যেহেতু তারা প্রায়শই নানান অসুখে ভুগে থাকে। স্থানীয় বহুমুখী সংস্থা থেকে নেয়া ঋণও তাদের জীবন জটিল করে তোলে। অনেক সময় এই ঋণ নারীদের অবস্থা জটিল করে তোলে যদিও ঋণ নেয় পুরুষেরা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোন থেকে মানুষ এসে বস্তিতে জড়ো হয়, এদের কেউ কেউ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ক্রমাগত স্থানান্তর করতে থাকে। ফলে এলাকায় সংহতি স্থাপন কঠিন হয়।

- **বিনোদনমূলক ব্যবস্থা :** এসব এলাকায় ছেলে-মেয়েদের জন্য কোনো খেলার মাঠ বা বিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেই।

- **নেশাসক্তি :** অনেক কিশোর নানা ধরনের নেশায় আসক্ত হয় যেমন ইয়াবা, গাঁজা, সিগারেট ইত্যাদি।

- **বেকারত্ব :** অনেক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক টানাটানির জন্য ঝরে পড়ে। পাশাপাশি কাজের সুযোগ না থাকার ফলে উত্ত্যক্ত করার মতো যৌন হয়রানিমূলক অপরাধসহ নানান অপরাধের সাথে জড়িয়ে ঝরে পড়ে। তবে অনেকে স্থানীয় তৈরি পোষাক কারখানায় কাজ করে, গৃহকর্মীর কাজ করে (মেয়েরা), গ্যারেজ বা পরিবহন ব্যবস্থায় কাজ করে (ছেলেরা)।

- **বাল্যবিবাহ :** থাকার জায়গার অভাবও বয়ঃসন্ধির মেয়েদের বাল্য বিবাহের অন্যতম কারণ, যেহেতু শহুরে এলাকায় বাড়ি ভাড়া অনেক বেশি (মাসিক অন্তত: ৩০০০ টাকা)। আর্থিক কারণ একটা ভূমিকা পালন করে অল্প বয়সী মেয়েদের দ্রুত বিয়ের ক্ষেত্রে। কোনো কোনো মা-বাবা দৈনিক খরচ কমাতে মেয়ের জলদি বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান। তবে সম্প্রতি এই পরিস্থিতি কমে আসছে বলে দেখা যাচ্ছে কেন না অনেক এনজিও এটি নিয়ে কাজ করে চলেছে স্থানীয় এলাকাগুলোর নেতাদের সাথে। তাছাড়া, আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তিও (মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট) বাল্য বিবাহের একটি কারণ, যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়ে এবং নিজের পছন্দে বিয়ে করে।

- **বিয়ে :** মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহিত জীবন একটি লজ্জাজনক বা অপমানের ব্যপার, কারণ এতে কোনো সম্মান নেই এবং তাদের কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে না। এছাড়াও, স্বামীরা নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারলেও স্ত্রীদের জন্য অনেক বিধিনিষেধ থাকে। পরিবার ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য কোনো অর্থ চাইলে নারীরা অনেক সময় শারীরিক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হন, যা এমনকি অনেক সময় বিচ্ছেদে গড়ায়। আবার স্বামীরা স্ত্রীর বয়স বাড়লে অন্য নারীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

- **শিশু-কিশোর সন্তানদের সাথে সম্পর্ক:** শিক্ষা, চলাচল এবং আধুনিক প্রযুক্তি (মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, টিভি ইত্যাদি) কিশোর কিশোরীদেরকে নিজেদের মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এর সাথে বেশিরভাগ মা-বাবা নানানরকম আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে এবং দিনে বেশিরভাগ সময় কাজে থাকে। এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিশোর কিশোরীরা মা-বাবাকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন- অনেক সময় কিশোর কিশোরীরা অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়াই প্রেম করা শুরু করে এবং বিয়ে করে। কিশোর কিশোরীদের কথা বলার স্বাধীনতা থাকেনা পরিবারে। তুলনামূলকভাবে শরীফ ও তুহিন বলে যে, ছেলেদের কোনো কোনো কথা মা-বাবারা খুব ভালোভাবে নেয়। তবে তা কিশোরীদের ক্ষেত্রে ঘটে না বললেই চলে।

- **যৌন হয়রানি :** যৌন হয়রানি একটি প্রধান সমস্যা কিশোরী মেয়েরা যার মুখোমুখি হয় এবং ফলে বাল্য বিবাহ ঘটে। মেয়েরাই পরিবারের সম্মানের প্রতীক। তাই মা-বাবাদের প্রবণতা হলো এই 'সম্মান'-এর নিরাপত্তা বজায় রাখা। যৌন হয়রানি হলো 'সম্মান'-এর বিপদে পড়ার সতর্ক ঘণ্টা। তাই তারা মেয়েদের শীঘ্র বিয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। বস্তি এলাকায় অভিভাকরা কিশোরীদের সাথে যৌন হয়রানিমূলক ঘটনার প্রতিবাদ করে পদক্ষেপ নেবার মতো সংবেদনশীল নয়। এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগের অভাব এবং পুলিশের অসচেতনতা এমন ঘটনার পেছনে মূল কারণ। এছাড়া, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা অনেক সময় এমন ঘটনার সাথে জড়িত থাকে, তারা আইন নিয়ে মাথা ঘামায় না। মা-বাবাদের প্রবণতা থাকে যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটলে তা গোপন করে যাওয়া বা আক্রান্তকে আত্মীয়ের বাড়িতে প্রেরণ করা। অনেক সময় তারা এলাকা ছেড়েও চলে যায় যদি এটি তাদের স্থায়ী নিবাস না হয়। কদাচিৎ তারা স্থানীয় থানায় জিডি করেন।

- **আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি :** মোবাইল সেট সস্তা ও সুলভ হবার কারণে এবং ইন্টারনেট রেট কম হবার ফলে কিশোর-কিশোরীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং পর্নো এবং ধর্মীয় মৌলবাদিতার সাথে পরিচিত হয়। যা তাদের সুস্থ মানসিক বিস্তারের প্রতিবন্ধক।



চিত্র : মোহাম্মদপুরের স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে এফজিডি

৪.২ এফজিডি থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ

- বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং করতে হবে যেন কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন বয়ঃসন্ধিকালীন বিষয়ে (মানসিক, শারীরিক ইত্যাদি) সচেতন হতে পারে।
- সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কিশোর-কিশোরীদের জন্য সহায়তার ওপরে জোর দিতে হবে। তাছাড়া কাজ/কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক এসব বস্তি এলাকার মানুষদের জন্য যথেষ্ট আবাসন ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে।
- মা-বাবাদের সংবেদনশীল হতে হবে যেন তারা সন্তানের মানসিকতা, কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সচেতন হতে পারেন এবং তাদের সাথে আরও সময় কাটাতে পারেন। সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত যেন কিশোর-কিশোরীরা তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।
- অভিভাবকদের উচিত প্রজন্মের ব্যবধান কমিয়ে আনার ওপর জোর দেয়া যেহেতু নতুন প্রজন্ম তাদের চাইতে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ভালো বোঝে।
- বিট পুলিশের (ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ২০১৬) [পুলিশের পরিভাষায় বিট হচ্ছে কোনো এলাকা এবং সময় যখন পুলিশ পাহারা দেয়] তালিকা বিদ্যালয়, বাজার এবং রাস্তার দর্শনযোগ্য স্থানে দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে হবে, যেন কিশোরীরা উত্ত্যক্ত হওয়া এবং অন্যান্য যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দিতে পারে। মানুষ ড্রাগ কেনাবেচার কথাও পুলিশকে জানাতে পারে। আর স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সেলারকে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য এসব খবর জানানো উচিত।
- স্থানীয় মানুষেরা মিলে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি কমিটি গঠন করতে পারে এবং কমিটির সদস্যের নাম্বার সবার কাছে বিলি করা হতে পারে যেন কিশোরীরা কোনো ঘটনা ঘটলে তাদের জানাতে পারে এবং তারা সে মোতাবেক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন। এই কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া ওয়ার্ড কাউন্সেলারকে জানাতে হবে এবং এ বিষয়ে তার মনোযোগ চাওয়া যেতে পারে।

- মা-বাবার উচিত সন্তানদের অবস্থা ও উন্নতি জানার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অভিভাবকদের বৈঠকে অংশ নেওয়া এবং নিজেদের দায়িত্বের বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়া।
- প্রেমের সম্পর্কে না জড়াতে বা প্রেমের জন্য অনেক সময় ব্যয় না করার জন্য কিশোর-কিশোরীদের সংবেদনশীল করতে হবে, বরং তাদের লেখাপড়া এবং সহপাঠক্রম বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। তাছাড়া, মানসম্পন্ন মানুষকে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার জন্য তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- জন্ম নিবন্ধন সনদসংক্রান্ত দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে হবে।
- আইনপ্রয়োগকারীদের আরও দ্রুত সক্রিয় হতে হবে এবং যৌনহয়রানি, সহিংসতা ও নেশার দ্রব্য বিক্রি রোধ করার ক্ষেত্রে উদাহরণ তৈরি করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য সুবিধা গঠন ও সুবিধা দিতে হবে।
- সরকার ও এলাকার মানুষদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা (খেলার মাঠ, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, গ্রন্থাগার ইত্যাদি) করতে হবে।
- কর্মজীবী মা-বাবার সন্তানদের জন্য সাশ্রয়ী দিবাযত্ন কেন্দ্র বা অনুরূপ সুবিধা বাড়াতে হবে।

৫. বস্তি এলাকায় জেন্ডার বৈষম্য কমানোর টুল হিসেবে গণগবেষণা

এই গণগবেষণায় ১০ জন অ্যানিমেটর একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে একথা বলা যায় কারণ তারা অন্যদের চেতনায় নাড়া দিতে পেরেছে এবং উপরোক্ত সমস্যাগুলো জেনেছে এবং প্রতিবিধান করতে পেরেছে।

গণগবেষণা দল সদস্যদেরকে একটি সাধারণ প্লাটফর্মে একরকম মনোভাব নিয়ে এক করেছে ।

দল সদস্য এবং অ্যানিমেটররা তাদের চারপাশ নিয়ে, তারা বাড়িতে এবং বাইরে যা যা করে, তাদের যে সম্মান পাবার কথা ও সমাজে তাদের যে স্থান, তাদের স্বপ্ন ও আশা এবং নিজেদের চিন্তার ক্ষমতার ব্যাপারে এখন আরও অনেক বেশি সচেতন। তারা এখন অনেক নিবিড়ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। এটি তাদের লেখার দক্ষতা, নৈপূণ্য, বাচনভঙ্গী, কথা বলার ধরনের ওপর অনেক প্রভাব ফেলেছে এবং জেন্ডার সচেতনতায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমৃদ্ধ করেছে। গণগবেষণা মানুষের সচেতনতার স্তরে কাজ করে। যদি কেউ গণগবেষণা প্রক্রিয়াটি আত্মস্থ করতে পারে, তাহলে তার ভবিষ্যৎ কর্মে তা প্রতিফলিত হবে। তারা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় সেগুলো নিয়ে সক্রিয়ভাবে সেগুলো নিয়ে ভাবে। এটি সম্ভব করেছে গণগবেষণা। পল্লবীর একজন অ্যানিমেটর একটি দারুণ মন্তব্য করেছে। সে বলেছে, "আমি আগে জানতাম না সমস্যা নিয়ে কীভাবে এগোব, তাই যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছি, সমাধানের জন্য অপরের কাছে গেছি এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। কিন্তু এখন আমি জানি, আমরা নিজেরাই আমাদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট আর সেজন্য এখন আর আমরা পরনির্ভরশীল নই।"

তরুণ গণগবেষকদের মধ্যে এত দ্রুত জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি হতে দেখা একটি অসাধারণ অর্জন। গণগবেষণার এই সাফল্য কাজ ও চর্চ্চায় স্পষ্ট। দেখা গেছে যে প্রতিটি দলই তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পেরেছে, সক্রিয় কর্মভিত্তিক সমাধান খুঁজে পেয়েছে এবং সেই সমাধানকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, আর এই সবকিছুই তারা অত্যন্ত কম সময়ে সম্পন্ন করেছে। এমন সক্রিয় কর্মভিত্তিক পদক্ষেপ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হবার জন্য প্রধান, যা তাদের দূরদৃষ্টি এবং উন্নয়ন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষতার তারা উন্নয়ন ঘটিয়েছে তা হলো তথ্য জানার অধিকার আইন সম্পর্কে জানা। তারা আরও জেনেছে এই আইন ব্যবহার করে কীভাবে আবেদনপত্র লিখতে হয়। আরটিআই আইন হচ্ছে নাগরিক-বান্ধব আইন। যদি নারী সিদ্ধান্ত নেয় জেন্ডার বৈষম্যের ওপর তথ্যের জন্য এই আইন ব্যবহার করবে, তাহলে সেটি জেন্ডার সমতার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। তাই এই আইনের সচেতনতা দল সদস্যদের জন্য ভবিষ্যতে জেন্ডার সমতায় কাজ করার জন্য একটি ভালো সম্ভাবনা ।

তারা আরও শিখেছে সম্মিলিতভাবে কীভাবে সময় ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সব দলই তাদের বন্ধু, বড়দের এবং বয়স্কদের কেস স্টাডি সংগ্রহকালে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করায় সাফল্য দেখিয়েছে ।
রিইব গণগবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে জেন্ডার সমস্যাকে চিহ্নিত করতে এবং পাঁচটি বস্তি এলাকায় সমস্যার সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছে। এই প্রকল্পের সময়সীমা ছিল ৬ মাস, গণগবেষণা পদ্ধতিটি ফলপ্রসূভাবে কাজ করার পক্ষে খুবই কম সময়। তবে ৫০ জন কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগই পদ্ধতির সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছে।

৬. উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশের সমাজে আজও কিশোর-কিশোরীদের সমস্যাকে গভীরভাবে দেখা হয় না, যদিও আজকের কিশোর-কিশোরী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। না মা-বাবারা, না সমাজ গুরুত্ব দেয় তাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গীকে। বর্তমান সময়ে এই অজ্ঞানতা আরও বেশি সমস্যাজনক, যখন কিনা ডিজিটাল যুগের উপজাত কিশোর-কিশোরীদের মন অতি দ্রুত বদলে দিচ্ছে।

এই প্রকল্প এসব কিশোর-কিশোরীর চোখ খুলে দিয়েছে। তারা শুধু যে আশেপাশের সমস্যা সম্পর্কে জেনেছে তাই নয়, বরং এসব সমস্যা আলোচনা ও চিহ্নিত করতে গিয়ে নিজেদেরও গভীরভাবে জানতে পেরেছে। তারা জীবনকে অন্যভাবে দেখতে শিখেছে, অনেক পরিপূর্ণভাবে। এমন একটি উদাহরণ পল্লবী দলের আলোচনায় স্পষ্ট ছিল যখন তারা বিখ্যাত উদ্ধৃতি "নিজেকে জানো" নিয়ে আলোচনা করছিল। সেই আলোচনা তারা জীবনে কী করতে চায় এবং ভবিষ্যতে তারা কী চায় তা ঠিক করতে তাদেরকে সাহায্য করেছে একথা বলা যায়।

এসব কিশোর-কিশোরী অ্যানিমেটর এবং গণগবেষকরা শুধু যে সমস্যা চিহ্নিত করেছে তাই নয় এর অর্ন্তনিহিত কারণও বের করতে চেষ্টা করেছে। তারা গণগবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে এবং তার মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিতে গবেষণা করতে শিখেছে। তারা সম্মিলিত চিন্তার প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সম্মিলিত চিন্তা দিয়ে তারা বড় সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছে এবং সেসব সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর আগে তারা কখনও ভাবেনি যে সমস্যার সমাধানে তাদের কিছু করার ক্ষমতা আছে। গণগবেষণা পদ্ধতি তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছে।

তারা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা অর্জন করেছে। তারা এখন একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করা, সেটা বিশ্লেষণ করা এবং সমাধানের পদক্ষেপ নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। তাছাড়া, সমস্যা সমাধান করা, কর্তৃপক্ষ ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, তারা এখন নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী। তারা আরও ভালো নাগরিক হয়ে উঠছে।

এটা বলা যায় না যে দলের সব সদস্যই সমানভাবে সক্রিয় ছিল। তবে, বেশিরভাগ সদস্যরা সক্রিয়ভাবে গণগবেষণা দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। একসাথে কাজ করার সময় বয়সের বিবেচনায় তারা অতি চমৎকার স্থিতধী আর শৃঙ্খলা দেখিয়েছে ।

এমন নয় যে তারা গবেষণাকালে চিহ্নিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে আর আমাদের সেটা লক্ষ্যও ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল তাদেরকে গণগবেষণার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান অন্বেষণ এবং সমাধানের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো এবং তাদেরকে পুরো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত করা, এক্ষেত্রে এসব কিশোর-কিশোরীরা অত্যন্ত সফল ছিল।

আমরা আশা করব যে এসব কিশোর-কিশোরীরা গণগবেষণার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যহত রাখবে এবং একদিন তারা গণগবেষণার মাধ্যমে দেশকে বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নয়নের দিকে এবং তাদের জন্য বাসযোগ্য অবস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সুপারিশ

কিশোর কিশোরীদের উন্নয়নে গণগবেষণা দলের সুপারিশের অংশ বিশেষ নিচে দেয়া হলো

১. বস্তিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের কারণে অন্য শ্রেণির মানুষের চাইতে বৈষম্যের শিকার হয় বেশি। সরকারি ও বেসরকারি নীতিতে এই বাস্তবতার প্রতিফলন থাকা উচিৎ।

২. বস্তিতে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা এই কিশোর-কিশোরীদের কোনো মানবাধিকার নেই। বিভিন্ন সংস্থার এই ইস্যুর ওপরে জোর দিতে হবে।

৩. কিশোর-কিশোরী অভিভাবকদের সচেতনতা প্রশিক্ষণ অত্যন্ত দরকার, যেন তাঁরা তাদের সন্তানদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন।

৪. জেন্ডার বৈষম্য, বাল্যবিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করার প্রধান ধাপ হলো উচ্চ শিক্ষা, জীবন দক্ষতার উন্নয়ন এবং কাজের সুযোগ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে নজর দিতে হবে।

৫. মা-বাবাদের সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্কুল। কিশোর-কিশোরীদের শুধু নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না, সম্মানও করতে হবে। তাদের জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

৬. কিশোর-কিশোরীরা অনেক সম্ভাবনাময়। যদি তাদের সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তারা জেন্ডার সমতা, জীবন দক্ষতার উন্নয়নে বিপ্লব ঘটাতে পারে। ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী জাতি গঠন করতে পারে। গণগবেষণা এই ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। তাই, গণগবেষণা পদ্ধতিটি সরকারি ও বেসরকারি দুই নীতি নির্ধারণেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. নারী অধিকার স্থাপন করতে অংশগ্রহণমূলক জেন্ডার অডিট টুলস সকল সংস্থাকে ব্যবহার করতে হবে।

৮. নাগরিক অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হলে তথ্য অধিকার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করবে যে, কিশোর-কিশোরীদের যখনই কোন তথ্য প্রয়োজন পড়বে তখন তারা সেটা নিশ্চিতভাবে পাবে। কারণ আমরা জানি যে তথ্যই শক্তি।

৯. শিক্ষা ও সামাজিক পরিসরে কিশোর-কিশোরীদের গুরুত্ব নিয়ে দেখতে হবে। তারা ভবিষ্যতের ভিত্তি তাই তাদের সমগ্র চিন্তা ভাবনা সমাজে পরিবর্তন আনবে। এই পরিবর্তনগুলো হলো অর্থনৈতিক, মানসিক, সামাজিক এবং সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত।

১০. এই প্রক্রিয়া শুধু যে সফলভাবে জেন্ডার বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং অন্যান্য সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে এই প্রকল্পে তা-ই নয়, এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যাবে সে সম্পর্কেও মতামত সংগ্রহ করেছে। টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ), ইতালিয়া এসব সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধানে তাদের গবেষণা এগিয়ে নিতে পারে ।

তথ্যনির্দেশ

অ্যান্ডারসন, এম. এল. (১৯৮৮), থিঙ্কিং এবাউট ওম্যান: সোসিওলজিকাল পার্সপেক্টিভস অন সেক্স অ্যান্ড জেন্ডার, ম্যাকমিলান পাব্লিশিং কোম্পানি, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স (বিবিএস).(২০১৫) সেন্সাস অফ স্লাম এরিয়াজ অ্যান্ড ফ্লোটিং পপুলেশান, বিবিএস, গভর্নমেন্ট অফ দ্যা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ।

বেনেরিয়া, এল. অ্যান্ড সেন,গ. (১৯৮১), 'একুমুচলেশন অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড উওমেন্স রোল ইন ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট : বোজেরাপ রিভিজিট', সাইন, ভলিউম ৭, নম্বর ২, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্যা সেচুয়াল ডিভিশন অফ লেবার (উইনটার, ১৯৮১), পৃ-২৭৯-২৯৮

বোর্দা, ও. এফ. (২০০১) "পার্টিসিপেটরি (অ্যাকশন) রিসার্চ ইন সোশাল থিওরী : অরিজিনস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস", হ্যান্ডবুক অফ অ্যাকশন রিসার্চ: পার্টিসিপেটিভ ইনকোয়ারি অ্যান্ড প্রাকটিস, রি. রিজন অ্যান্ড এইচ. ব্রাডবেরি (সম্পাদিত), সেজ পাবলিকেশন, লন্ডন থাউজেন্ড ওকস, নিউ দিল্লী ব্রাইডন, এল, অ্যান্ড চ্যান্ট, এস, (১৯৮৯) উওমেন ইন দা থার্ড ওয়ার্ল্ড: জেন্ডার ইস্যুস ইন রুরাল অ্যান্ড আরবান এরিয়াজ, রুটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ব্রুন্সউইক, নিউ জার্সিসেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ), (২০১৬) দা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক, সাউথ এশিয়া : বাংলাদেশ, সিআইএ [অনলাইন], এভেইলেবেল:, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html [প্রবেশ সময় ১২ নভেম্বর, ২০১৬]

কর্টেজ, আর, (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক), হিনসন, এল, (আইসিআরডব্লিউ), অ্যান্ড পেট্রোনি, এস, (আইসিআরডব্লিউ), (২০১৪) নলেজ ব্রিজ: হেলথ, নিউট্রিশান অ্যান্ড পপুলেশন গ্লোবাল প্র্যাকটিস। অ্যাডোলসেন্ট সেচুয়াল অ্যান্ড রিপোডাক্টিভ হেলথ ইন ঢাকা'জ স্লামস, বাংলাদেশ [অনলাইন], এভেইলেবেল: http://www.blast.org.bd/content/news/knowledge-briefs.pdf [প্রবেশ সময় ১০ নভেম্বর, ২০১৬]

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, (২০১৬) এবাউট বিট পোলিসিং, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ [অনলাইন], এভেইলেবেল: http://dmp.gov.bd/application/index/page/about-beat-policing [প্রবেশ সময় ১২ নভেম্বর, ২০১৬]

ফ্রেইরে, পি, (১৯৭২), "কালচারাল অ্যাকশন ফর ফ্রিডম", হারমোন্ডসওর্থ, পেঙ্গুইন
কবির, এন, (১৯৮৮), 'সাবঅর্ডিনেশন অ্যান্ড স্ট্রাগল : উওমেন ইন বাংলাদেশ', নিউ লেফট রিভিউ, ভল্যুম নম্বর আই, পার্ট নম্বর ১৬৮

মাহবুব উল হক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, (২০১৪) আরবানাইজেশন অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট: আ নিউ লুক, মাহবুব উল হক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার [অনলাইন], এভেইলেবেল : http://mhhdc.org/wp-content/themes/mhdc/data/publications/Ubanization_and_Human_Development.pdf [প্রবেশ সময় ১৩ নভেম্বর, ২০১৬]

মার্গারেট এল. এ. (১৯৮৮), থিঙ্কিং এবাউট ওম্যান : সোসিওলজিকাল পার্সপেক্টিভস অন সেক্স অ্যান্ড জেন্ডার, ম্যাকমিলান পাব্লিশিং কোম্পানি,

রহমান, এম. এ. (১৯৯৪), পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট : পার্সপেক্টিভ অন পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ- আ জার্নি থ্রু এক্সপেরিয়েন্স, ইউপিএল, ঢাকা

রেনজেত্তি, সি. এম.অ্যান্ড ক্যুরিন, ডি. জে.(১৯৮৯), উওমেন, মেন অ্যান্ড সোসাইটি : দা সোসিওলজি অফ জেন্ডার; এলিন অ্যান্ড বেকন, বোস্টন

ইউএনডিপি, (২০১৫), টেবল ৫ : জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্স, ইউএনডিপি [অনলাইন], এভেইলেবেল : http://www.hdr.undp.org/en/composite/GII [প্রবেশ সময় ১০ নভেম্বর, ২০১৬]

ইউনিসেফ, (২০১৬) বাংলাদেশ : দ্যা চিল্ড্রেন, ইউনিসেফ [অনলাইন], এভেইলেবেল : https://www.unicef.org/bangladesh/children_356.htm [প্রবেশ সময় ১০ নভেম্বর, ২০১৬]

ইউনাইটেড নেশনস ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএনডিইএসএ), (২০১৬) ডেফিনেশন অফ ইয়ুথ, ইউএনডিইএসএ [অনলাইন], এভেইলেবেল: http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf [প্রবেশ সময় ১২ নভেম্বর, ২০১৬]

ট্রিবিউন রিপোর্ট, (২০১৪) 'স্টাডি: হাফ অফ ম্যারিড অ্যাডোলসেন্ট গার্লস ফেস সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স', ঢাকা ট্রিবিউন [ঢাকা], ৪ ডিসেম্বর [অনলাইন], এভেইলেবেল: http://archive.dhakatribune.com/crime/২০১৪/ফবপ/০৪/study-half-married-adolescent-girls-face-sexual-violence [প্রবেশ সময় ১০ নভেম্বর, ২০১৬]



এলমা আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



আইরিন আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



ঝুমা আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



আল আমিন
১৬ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



মো.আল আমিন
১৭ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



মনিষা হোসেন
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



নাসরিন আকতার শান্তা
২০ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



সাবিনা আক্তার
২০ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



সাথী আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



উষা আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



আলো আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



পাপিয়া আক্তার দোলা
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



সুমাইয়া আক্তার দোলন
১৭ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



মায়া
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



নূর ই জান্নাত রূপা
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



শাহনাজ
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



শরিফ
১৯ বছর
ছাত্র
স্থানীয় অ্যানিমেটর



স্বর্ণা আক্তার
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



সুমা আক্তার
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



তুহিন খান
১৬ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



পিয়া আলী
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য

পল্লবী



আদুরি আক্তার
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



বন্যা আক্তার
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



বর্ষা আক্তার সোনিয়া
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



লাকি আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



মো. রুহুল আমীন
১৯ বছর
ছাত্র
স্থানীয় অ্যানিমেটর



মো. শাহিন আলম
১৭ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



রোকেয়া আক্তার
১৮ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



রুবিনা আক্তার
১৮ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



সুমাইয়া সুলতানা লিটা
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



জাকিয়া আক্তার
১৮ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



খাদিজা আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য

রায়ের বাজার



বন্যা আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



দীপা আক্তার
১৬ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



জান্নাতুল ফেরদৌস
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



কোহিনূর আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



ইসলাম মিঞা
১৭ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



মো.রাশেদ
১৫ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



রুবিনা আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



স্বর্ণা আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



তানিয়া আক্তার
১৬ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



টুম্পা আক্তার
১৬ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর

বাউনিয়া বাঁধ



রুবেল রানা
১৪ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



আয়েশা আক্তার হাসনা
১৮ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



সাহেরা আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



লাবনী আক্তার
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



মীম আক্তার
১৪ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



বিপাশা আক্তার
১৮ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



নওশিন নাহার খাদিজা
১৮ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



আমেনা আক্তার শিল্পী
১৮ বছর
ছাত্রী
স্থানীয় অ্যানিমেটর



মো: জাহিদুল ইসলাম রাব্বি
১৫ বছর
ছাত্র
গণগবেষণা দলের সদস্য



বাবলী আক্তার তানিসা
১৯ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



জাকিয়া আক্তার
১৭ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য



টিনা আক্তার
১৫ বছর
ছাত্রী
গণগবেষণা দলের সদস্য

পূর্বে ৫০ জন কিশোর-কিশোরী গণগবেষকদের কথা উল্লেখিত হলেও এখানে ৫৪ জনের ছবি রয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এই তারতম্যের কারণ হচ্ছে গবেষণা চলাকালীন কয়েকজন কাজ ছেড়ে দেয় এবং তাদের জায়গায় নতুন সদস্য যুক্ত হয়।